মুসলমানদের ঈমান-আমল ঠিক রাখার জন্য

দাওয়াতের মেহনতের বিকল্প নেই

মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

*১৫ জানুয়ারী ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব ইজতিমার প্রাক্কালে খিলগাঁও রেলগেট বাজার জামে মসজিদে প্রদত্ত **বয়ান***

হামদ ও সালাতের পর...

বুযুর্গানে মুহতারাম! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে হাতে গোনা কিছু করণীয় কাজ, আর কিছু বর্জনীয় কাজ দিয়েছেন। এগুলোকে শরীয়ত বলা হয়। শরীয়তের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, প্রশস্ত রাস্তা, মহাসড়ক। এ মহাসড়ক এমনই প্রশস্ত যে, চাইলে সকলেই একসঙ্গে চলতে পারবে। পথিকের তুলনায় রাস্তার প্রশস্ততা কম, এমন নয়। সংখ্যা যত বেশিই হোক এতে সকলের জায়গা হয়ে যাবে। এই রাস্তার শেষ মাথায় জান্নাত। এই রাস্তা কিয়ামতের ময়দানের সঙ্গে সংযুক্ত। কিয়ামতের ময়দানে এই রাস্তার দ্বিতীয় অংশ। তার নাম পুলসিরাত। উভয় রাস্তা একই। দুনিয়াতে শরীয়ত, আখেরাতে পুলসিরাত। আরবীতে যাকে শুধু 'সীরাত' বলা হয়। এই দ্বিতীয় রাস্তা গিয়ে লেগেছে একেবারে জান্নাতের প্রধান ফটকের সঙ্গে। এই পথের প্রতিজন পথচারী জান্নাতে পৌঁছে যাবে।

এই রাস্তার ডানে বামে আরও অনেক রাস্তা আছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে সতর্ক করে বলেছেন, খবরদার! তোমরা কক্ষণো ডানে বাঁয়ের রাস্তায় চলবে না। ওগুলো শয়তানের রাস্তা, দোযখের রাস্তা। ওসব রাস্তার মোড়ে মোড়ে একেকটা শয়তান দাঁড়িয়ে ঐ রাস্তার গুণাগুণ বলছে; এই রাস্তায় চললে এই এই মজা পাবে। কিন্তু সেগুলো প্রত্যেকটাই হারাম মজা। ঐসব মজার স্বাদ আস্বাদন করতে গেলে আসল ও চিরস্থায়ী মজা নষ্ট হয়ে যাবে। ইবলিস যে মজা ও আনন্দের দাওয়াত আমাদেরকে দিয়ে যাচ্ছে, তা ক্ষণস্থায়ী। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেছেন, এই মজার দৃষ্টান্ত দাদ (চুলকানি বিশেষ)এর মত। যতক্ষণ চুলকানো হয়, খুব মজা অনুভূত হয়। কিছুক্ষণ পর যখন জ্বালাপোড়া শুরু হয় তখন খুব কষ্ট হয়। গুনাহের মজাও তদ্রূপ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শরীয়ত দান করেছেন। অর্থাৎ কিছু কাজ করতে বলেছেন আর কিছু কাজ ছাড়তে বলেছেন। করণীয়গুলো কষ্টকর হলেও করতে হবে, বর্জনীয়গুলো কষ্টদায়ক হলেও বর্জন করতে হবে। ডাক্তারের কথায় আমরা কষ্ট স্বীকার করেও তেতো ঔষধ সেবন করি, প্রাণনাশের আশঙ্কা নিয়েই অপারেশন করাই। ওপেন হার্ট সার্জারী করতে কত টাকা লাগে! তার উপর আবার লিখিত গ্যারান্টি দিতে হয় যে, চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু হলে বা হুঁশ না ফিরলে ডাক্তারদের উপর কোন অভিযোগ আপত্তি থাকবে না; তারা সব ধরনের দায় থেকে মুক্ত থাকবেন। লাখ লাখ টাকা বিল দেয়া হচ্ছে, আবার সমস্ত দায় থেকে মুক্তিও দেয়া হচ্ছে, শুধুমাত্র একটু সুস্থ হওয়ার আশায়। দুনিয়ার একটু সুস্থতার জন্য যদি এত বড় কষ্ট স্বীকার করা যায়, তাহলে বলুন জান্নাত পাওয়ার জন্য আমাদের কষ্ট স্বীকার করার দরকার আছে কিনা? অবশ্যই দরকার। এই সামান্য কষ্ট স্বীকার করার পরই আল্লাহ তা'আলা আমাদের চিরস্থায়ী শান্তির আবাস জান্নাত দান করবেন। যেখানে প্রবেশের পর আর কোনদিন বের করা হবে না। যার প্রতিটি নেয়ামতই অতুলনীয়। যার প্রাসাদগুলো স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা, ইয়াকুত, যাবারজাদ পাথরের তৈরী। যেখানে খাঁটি দুধের নহর থাকবে। নির্ভেজাল পরিশোধিত মধুর নহর থাকবে। বাগানে সব রকম ফলের গাছ-গাছালি থাকবে। সেখানে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। সবচে' বড় নেয়ামত, আল্লাহ তা'আলার দীদার নসীব হবে। আমরা সবাই আল্লাহ তা'আলাকে কোন কষ্ট ছাড়াই দেখতে পাব। কোন ভিড় বা সিরিয়ালের কষ্ট করতে হবে না। হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে, চাঁদনী রাতে সবাই যেমন একসঙ্গে চাঁদ দেখে, এতে কারও কোন কষ্ট হয় না। তদ্রূপ আল্লাহকে সবাই দেখতে পাবে, কেউ মাহরূম হবে না। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৫৪, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২১১)

শরীয়তের করণীয় বিষয়াদির অন্যতম একটি হল দাওয়াত। শাব্দিক অর্থ আহ্বান। ব্যাপকভাবে দাওয়াতের কাজ শুধুমাত্র এই উম্মতের দায়িত্ব। পূর্ববর্তী উম্মতের উপর এই দায়িত্ব ব্যাপকভাবে ছিল না। তার কারণ হল, হযরত আদম আ. থেকে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত অসংখ্য নবী-রাসূল এসেছেন। তাদের প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট গোত্র কিংবা দেশের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। আর আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরো পৃথিবীর নবী হয়ে এসেছেন। পৃথিবীর সকল জীন, ইনসান, মানব-দানব সকলের নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন।

মানুষের পূর্বে এ যমীন আবাদ ছিল জ্বীনদের দ্বারা। তারা লক্ষ লক্ষ বছর জীবিত থাকতো। কিন্তু তারা আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হল। তাই আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে পৃথিবীতে পাঠালেন।

পূর্বের যামানায় প্রত্যেক গোত্রে ভিন্ন ভিন্ন নবী আসতেন। তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেলে অনতিবিলম্বে ঐ গোত্রের আরেকজনকে নবুওয়াত দান করা হতো। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতার

মাধ্যমে তাঁর কাছে ওহী পাঠাতেন। ওহী পেয়ে ঐ নবী ঘোষণা দিতেন, إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون (অর্থ) নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমাকে মেনে চলো। আমি যা বলব, সব আল্লাহর পক্ষ থেকে, আমার নিজের পক্ষ থেকে নয়। তাই আল্লাহকে ভয় করে আমার কথা মানলে তোমরা কামিয়াব হয়ে যাবে। প্রত্যেক নবী-রাসূল এই কথাই বলতেন।

এক নবীর অবর্তমানে আল্লাহ দাওয়াতের কাজ এগিয়ে নেয়ার জন্য আরেকজন নবীকে পাঠিয়ে দিতেন। এভাবে দাওয়াতের কাজ চলতে থাকত। এজন্যই পূর্ববর্তী উম্মতের উপর এই যিম্মাদারী ব্যাপকভাবে ছিল না। তারা ব্যক্তিগতভাবে নামায, রোযা, হজ্ব ইত্যাদি আমলগুলো করতেন। এই মৌলিক আমলগুলো প্রত্যেক যামানায়ই ছিল।

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেষট্টি বছর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন। তাঁর পর আর কোন নবী আসবে না। তবে হযরত ঈসা আ. আসবেন। তিনি আমাদের নবীর উম্মত হয়ে আসবেন। যেহেতু আমাদের নবী কিয়ামত পর্যন্ত সকলের জন্য নবী হয়ে এসেছেন, তাঁর আনীত দীন ইসলামও কিয়ামত পর্যন্ত সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। আর এই দীন টিকে থাকবে দাওয়াতের মাধ্যমে। শুধুমাত্র উলামায়ে কেরামের মাধ্যমে নয়। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে শুধুমাত্র উলামায়ে কেরামকে সম্বোধন করেননি। বরং জনসাধারণকেও বলেছেন, তোমরা আমার কথা যে যতটুকু জানো, তা অন্যকে বলতে থাকো। দাওয়াত দিতে থাকো। (বুখারী শরীফ; হা. নং ৩৪৬১) আমাদের যতটুকু জায়গার মধ্যে চলাফেরা হয়, সেখানে দাওয়াত দেয়া ফরজে আইন। আর সারা বিশ্বের কাফের অমুসলিমদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানো, এর জন্য ইন্তিযাম করা, তারতীব বানানো ইত্যাদি ফরজে কেফায়া।

হযরতজী মাওলানা ইউসুফ ছাহেব রহ. বলতেন, 'দাওয়াতের দৃষ্টান্ত হল আগুন, অমুসলিমরা যেন কাঁচা গোশ্ত আর মুসলিমরা রান্না করা গোশ্ত। কাঁচা গোশ্ত রান্না করতে যেমন আগুনের প্রয়োজন হয়, অনুরূপ রান্না করা গোশ্তও ব্যবহারযোগ্য রাখতে আগুনের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ অমুসলিমদের মুসলমান বানাতে যেমন দাওয়াত দরকার, তদ্রূপ মুসলমানদের ঈমান-আমল ঠিক রাখার জন্যও দাওয়াতের মেহনত প্রয়োজন।'

তাই আমাদের দাওয়াতের মেহনত করতেই হবে, এর কোন বিকল্প নেই। কোন মুসলমান দাওয়াত ও তাবলীগের বিরোধিতা করতে পারে না। তবে হাঁ, তাবলীগের কাজ কোন স্থান–যেমন কাকরাইল, নিযামুদ্দীন, রায়বেন্ড–এর সঙ্গে নির্দিষ্ট নয়। তবে এসব মারকাযের মুরুব্বীগণ দাওয়াতের এই মহান যিম্মাদারীকে সুন্দর ইন্তিযামের সঙ্গে আঞ্জাম দিচ্ছেন। সেখানে গেলে সহজেই দাওয়াতের কাজ শেখা যায় এবং সহজ তরীকায় মানুষের ময়দানে দাওয়াতের কাজ করা যায়।

কুতবুল আলম শাইখুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধলবী রহ. 'ফাযায়েলে তাবলীগে'র প্রথম পরিচ্ছেদে সূরা হা-মীম সিজদাহ'র ৩৩নং আয়াত–

ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين এর তরজমা উল্লেখ করার পর লিখেছেন, 'মুফাসসিরগণ লিখেছেন, যে কোন ব্যক্তি যে কোন পন্থায় মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকবে, সে উপরোক্ত সুসংবাদ ও প্রশংসার উপযুক্ত হবে। যেমন আম্বিয়ায়ে কেরাম আ. মু'জিযা ইত্যাদির দ্বারা, উলামায়ে কেরাম দলীল-প্রমাণের দ্বারা, মুজাহিদগণ তলোয়ারের দ্বারা, মুয়াযযিনগণ আযানের দ্বারা আল্লাহর দিকে ডেকে থাকেন। মোটকথা, যে কোন ব্যক্তি কাউকে মঙ্গলের দিকে আহ্বান করবে, সে-ই উক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে। চাই সে জাহেরী আমলের দিকে আহ্বান করুক, কিংবা বাতেনী আমলের দিকে আহ্বান করুক। যেমন মাশায়েখ সূফীগণ মানুষকে আল্লাহর মা'রেফতের দিকে ডাকেন।' তবে প্রচলিত তাবলীগ একটি সুন্দর সুবিন্যস্ত পদ্ধতি। আল্লাহ তা'আলা হযরত মাওলানা ইলয়াস রহ.এর অন্তরে এই পদ্ধতি ঢেলে দিয়েছিলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ইলহাম হয়েছিল। এর মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় সহজে দাওয়াতের কাজ চলছে। আলহামদুলিল্লাহ।

দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত এবং কওমী মাদরাসাগুলোর ওসীলায় আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে টিকিয়ে রেখেছেন। অন্যথায় অমুসলিমদের চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের বানে অনেক আগেই আমাদের স্বকীয়তা, স্বাধীনতা ধ্বংস হয়ে যেত। আমরা যে স্বাধীনতার পক্ষে গান গাই, সে স্বাধীনতার বিরোধিতাও করি। প্রকৃত স্বাধীনতা কাকে বলে তা-ই তো আমাদের জানা নেই। এই দেশ কোন দাবীদারদের কারণে টিকে নেই। এই দেশ টিকে আছে দেওবন্দ মাদরাসার আদর্শে আদর্শবান কওমী মাদরাসা আর দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা এই দুই মেহনতের দিকে লক্ষ্য করে এই দেশকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহর কাছে দু'আ করি, এই মেহনত যেন আরও ব্যাপকতা লাভ করে। আমীন। তাহলে দেশও টিকবে, ইসলামও টিকবে। মুসলমানদের ইজ্জত সম্মানও ঠিক থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

আগে তো সারা বাংলাদেশের ইজতিমা একসঙ্গে হতো। এরপর দুই পর্বে করা হল। এখন তো তাতেও কুলানো যাচ্ছে না। তাই কোয়ার্টার সিস্টেম করা হয়েছে। প্রতি বছর দুই পর্বে ইজতিমা হবে। তবে দুই পর্ব মিলিয়ে অর্ধেক দেশের ইজতিমা হবে। সবাই এক বছর পরপর সুযোগ পাবে। প্রতি বছর অংশগ্রহণের সুযোগ না পাওয়ায় দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই। এতে ইনশাআল্লাহ কাজের প্রতি স্পৃহা আরো বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়াও এর মধ্যে আরো অনেক ফায়দা ও হেকমত নিহিত আছে, যেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখেই মুরুব্বীরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দাওয়াত ও তাবলীগের এই মহান যিম্মাদারী ইখলাস ও ইহতিসাবের সাথে আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

শ্রুতিলিখন : ইসমাতুল্লাহ
শিক্ষার্থী, ইফতা বিভাগ, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

স·ম·সা·ম·য়ি·ক প্রসঙ্গ

জনমবন্দীর জবানবন্দী

ইরফান জিয়া

আরাকান থেকে রাখাইন

যে দেশের মাটিতে আমি চোখ মেলেছি তার এখনকার নাম মিয়ানমার। আগে ছিল বার্মা। মিয়ানমারের একটি প্রদেশের নাম রাখাইন। রাখাইনের পূর্বনাম আরাকান। আরাকানের একদিকে বঙ্গোপসাগর, অন্যদিকে পাহাড়ের সারি। পাহাড়গুলো আরাকান এবং মিয়ানমারের মাঝখানে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা অংশে আছে নাফ নদী। ওপারে বাংলাদেশ।

এই পাহাড়, সাগর আর নদী ঘেরা আরাকানে আমার জন্ম। এখানেই আমি বড় হয়েছি। কাটিয়েছি জীবনের সত্তরটি বছর। বার্ধক্য এখন আমাকে চেপে ধরেছে। হারিয়ে ফেলেছি শক্তি ও মনোবল।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ। আমার বয়স তখন ষোল। বার্মায় সামরিক অভ্যুত্থান হল। ক্ষমতায় বসলো মাসক নেউইন। একদিন হঠাৎ দেখলাম গ্রামে আর্মিরা আক্রমণ করেছে। লোকজনকে ঘর থেকে বের করে মেরে ফেলছে। জ্বালিয়ে দিচ্ছে সবার বাড়ি-ঘর। আমার বাবা-মা তাদের পাঁচ সন্তানকে নিয়ে কোনমতে পালাতে সক্ষম হলেন। তিনদিন হেঁটে আমরা সীমান্তের কাছাকাছি চলে এলাম। বাবার ইচ্ছা ছিল সীমান্ত পার হয়ে অন্য কোন দেশে চলে যাবেন। কিন্তু আমি তার ইচ্ছা বুঝতে পেরে শক্তভাবে বেঁকে বসলাম। কিছুতেই দেশ ছেড়ে যাব না। জানি না সে বয়সে এত মনোবল কোথায় পেয়েছিলাম। তবে আমার মনে একের পর এক প্রশ্ন আঘাত হানছিল। আমরা কে? কেন আমাদের ওপর আক্রমণ করছে এদেশেরই সেনারা? আমরা কি এ দেশের নাগরিক নই? তাহলে কোন অপরাধে ওরা উজাড় করে দিচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম?

দীর্ঘদিন সীমান্তবর্তী এক এলাকায় আমরা লুকিয়ে থাকলাম। পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে ফিরে এলাম আমাদের গ্রামে। আমার পরিবার আবার স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে গেল। আর আমি খুঁজতে লাগলাম আমার প্রশ্নের উত্তর। ধীরে ধীরে আমার সামনে উন্মোচিত হতে লাগল অসংখ্য অজানা বিষয়।

ফিরে দেখা ইতিহাস

৮ম শতাব্দীর কোনএক সময়। আরাকান তীরবর্তী আকিয়াব বন্দরে ভিড়ল আরব বণিকদের জাহাজ। এ এলাকার নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া আর উর্বর ভূমি বণিকদের আকৃষ্ট করল। পড়ে থাকা অনাবাদী যমীনকে আবাদ করতে তারা এখানে বসবাস শুরু করল। এর বহু বছর পর তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকেও লোকেরা আরাকানে আসতে লাগল। এছাড়াও এখানে বসতি স্থাপন করল আফগানিস্তান ও অন্যান্য কয়েকটি দেশের লোকজন। এভাবে বিভিন্ন ধর্মের নানা রকম মানুষের আবাসস্থলে পরিণত হল আরাকান।

আগত মানুষদের অনেকেই ছিলেন মুসলিম। তাদের সুন্দর আচরণ আর মায়াভরা আহ্বানে অন্যরাও ইসলামে দীক্ষিত হয়। ফলে মুসলমানরা এ এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়। আরাকানের আদি নাম ছিল রোহাং বা রোসাং। সে থেকে এ জাতির নাম হয় রোহিঙ্গা।

এ জাতিরই একজন সদস্য আমি। আমার পূর্বপুরুষরা ছিলেন স্বাধীন। আরাকান ছিল আলাদা রাষ্ট্র। বিশেষ করে মিয়ানমারের কোনই অধিকার ছিল না আমাদের উপর। চৌদ্দ শতক থেকে আঠার শতক পর্যন্ত এ ভূখণ্ডে 'মারুক ইউ' রাজত্ব করেছে। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা নারামেইখলা মুসলমান ছিলেন। তার মুসলিম নাম ছিল সুলাইমান শাহ। রাজ দরবারের উচ্চপদস্থ সবাই ছিলেন মুসলিম। মহাকবি আলাওল এবং দৌলত কাজীর মত বিখ্যাত সাহিত্যিকগণ এ দরবারের শোভা বর্ধন করেছিলেন।

পরাধীন কড়চা

১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ। বার্মার রাজা বোদাদাউয়া আরাকান রাজ্য আক্রমণ করে। তার বাহিনী রোহিঙ্গাদের ওপর চালায় নির্যাতনের স্টিমরোলার। পরাজিত রোহিঙ্গাদের চোখের সামনে ডুবে যায় স্বাধীনতার সূর্য। জীবন বাঁচাতে হাজারো রোহিঙ্গা পালিয়ে যায় চট্টগ্রামে।

১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা আরাকানকে ব্রিটিশ-ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ওরা পুরো বার্মাই দখলে নিয়ে নেয়। এ সময় ব্রিটিশরা আরাকানকে বার্মার অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে। এরপর ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে বার্মা ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তিলাভ করে। আধিপত্যবাদ থেকে মুক্তির এ সংগ্রামে রোহিঙ্গারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল।

৪৮'র এই আশাপূর্ণ সময়ে আমার জন্ম। আমার বাবা বড় আশা করে মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার আশার কিছুটা বাস্তবায়ন হয়েছিল স্বাধীন বার্মার প্রথম শাসক অং সাং এর সময়ে। তিনি রোহিঙ্গাদের বার্মার নাগরিক বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি নিহত হওয়ার পর সামরিক শাসক উনু'র সময়েও শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বিরাজ করছিল।

কিন্তু ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে যখন সামরিক শাসক 'নেউইন' ক্ষমতাসীন হল, পূর্বের সকল রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়ে সে গণহত্যা শুরু করল। বাঁচার আকুতিতে অনেক রোহিঙ্গা বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমাতে লাগল। আমার বাবাও এটাই চেয়েছিলেন। শুধু

আমার কারণে সিদ্ধান্ত পাল্টে থেকে গেলেন জন্মভূমিতে ।

সব হারিয়ে একা

সময় বয়ে যায়। আমার বাবা-মা বৃদ্ধ হয়ে যান। আমি পরিণত হই যুবকে। এক সময় দাম্পত্য বন্ধনেও আবদ্ধ হই। রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন তখন ধীর লয়ে চলছে। মাঝে মাঝে বিভিন্ন স্থান থেকে নির্যাতনের খবর আসছে, তবে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ না হওয়ায় অনেকে ভয় নিয়েই থাকছেন।

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের কোন এক সকাল। আমাকে একটা কাজে দূরের গ্রামে যেতে হয়েছিল। ঘরে বৃদ্ধ বাবা-মা, স্ত্রী আর তিন সন্তান। যখন ফিরে আসি বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। গ্রামের কাছাকাছি হতেই আঁৎকে উঠলাম। পোড়া পোড়া একটা গন্ধ নাকে আসছে। আরো কাছে এসে লক্ষ্য করলাম, গ্রামের সব ঘর-বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সেনাবাহিনীর আক্রমণ থেকে যারা পালাতে পারেনি তাদেরকে পাইকারিভাবে হত্যা করা হয়েছে। আমার পরিবারের সবাইকে ঘরের মধ্যে বেঁধে তারপর আগুন ধরানো হয়েছে। আমার প্রিয় বাবা-মা, স্ত্রী এমনকি চার বছরের ছোট্ট মেয়েটি, যে সবেমাত্র গ্রামের মকতব থেকে সূরা ফাতিহা পড়া শিখেছে। ওদের কেউ বাঁচতে পারেনি এই নারকীয় আগুন থেকে। জ্বলেপুড়ে ওরা অঙ্গার হয়ে পড়ে থাকে। আপনজনদের হারিয়ে বড় একা হয়ে গেলাম। কানে বাজল, বাবা যেন বলছেন, কী বাছাধন! বলেছিলাম না এদেশ এখন আর আমাদের নেই! এ মাটি ছেড়ে চলে গেলেই ভালো হবে!

বাবা তো চলেই গেছেন। কিন্তু আমার আরো জেদ চেপে গেছে। ৭৮'র এই নিধনযজ্ঞের সময় দুই লাখের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। আমি আঁকড়ে থাকি রাখাইনের মাটি। সব হারিয়ে এখন আমি একা; মৃত্যু হলেও কোন পরোয়া নেই।

১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে অহিংসার বাণীধারী বৌদ্ধরা আবার হামলে পড়ে মুসলমানদের উপর। এই হামলায় বহু লোক নিহত হয়। হাজার হাজার মানুষ ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। নৌকায় করে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড বা বাংলাদেশে যাওয়ার চেষ্টা করে অনেকে। পথে ডুবে যায় অসংখ্য মানুষ।

এ সময়ে আমি বার্ধক্যে পৌঁছে গেলেও আমার প্রতিজ্ঞায় আমি অটল ছিলাম। যতো কিছুই হোক দেশ ছেড়ে যাব না। যাব না আমার শিকড় ছিঁড়ে।

বহমান এই সময়ে

২০১২ খ্রিস্টাব্দের এই নির্মূল অভিযানের পর এক লাখ পঁচিশ হাজার রোহিঙ্গাকে আটক করা হয়েছে। আশ্রয় শিবিরে রাখা হয়েছে এসব বন্দীদের। তাদের চলাফেরায় আরোপ করা হয়েছে কঠোর নিয়ন্ত্রণ। আটকে পড়া মানুষের মিছিলে আমিও আছি। শুরু হয়েছে আমাদের বন্দী জীবন। আশ্রয় শিবির থেকে বাইরে যাওয়ার কোন উপায় নেই। তাই বাইরের রোহিঙ্গাদের জীবনে কী ঘটছে তা ভালোভাবে জানতে পারছি না। কিন্তু গত ৯ অক্টোবর ২০১৬'র পর থেকে ঘটতে শুরু করে এমন সব ঘটনা যেগুলোর ভয়াবহতা আশ্রয় শিবিরের বেষ্টনী ভেদ করে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

সীমান্তবর্তী একটি পুলিশফাঁড়ি নাকি আক্রান্ত হয়েছিল। হামলাকারী কারা তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, মাদক পাচার চক্র বা বিচ্ছিন্ন কোন রোহিঙ্গা হতে পারে। শুধু এই ধারণার কারণে সাধারণ রোহিঙ্গাদের উপর নেমে এসেছে নারকীয় অত্যাচার। সেনাবাহিনী এবং সহিংস বৌদ্ধরা একযোগে হামলে পড়েছে নারী-পুরুষ ও অবুঝ শিশুদের উপর। ১০ নভেম্বরের মধ্যে পুড়িয়ে ফেলেছে ৮০০'র বেশি গ্রাম। ধ্বংস হয়েছে ২৫ হাজার বাড়ি, ৬০০ দোকান, ১২টি মসজিদ ও ৩০টির বেশি স্কুল। কত মানুষ যে শহীদ হয়েছে তার হিসেব নেই। বন্দী শিবিরেও মাঝে মাঝে সেনারা আসে। আমাদেরকে লাইনে দাঁড় করিয়ে চাবুক দিয়ে পিটায়। মানসিকভাবে দুর্বল করার জন্য আমাদেরকে কিছু ভিডিও দেখায়। যে ভিডিওগুলো ওরা রোহিঙ্গা পল্লীগুলো ধ্বংস করার সময় নিজেরাই উল্লাসের সাথে ধারণ করেছে। নির্যাতনের সেসব দৃশ্য দেখে আমাদের হৃদয় কেঁদে ওঠে। কী বর্বর! কত অসভ্য!

একটা মেয়েকে গাছে বেঁধে রাখা হয়েছে। হাত দুটো পিছনে। পা দুটো সামনে প্রলম্বিত। বৌদ্ধ হায়েনারা চাপাতি দিয়ে কোপাতে আরম্ভ করল। পায়ের পাতা থেকে উরু পর্যন্ত। এরপর বাঁধন খুলে দিয়ে কিছুক্ষণ ঘাড়ে কোপাল। তখনো ঘড়ঘড় শব্দ বের হচ্ছে গলা থেকে। একেবারে নিস্তব্দ করার জন্য চিৎ করে শুইয়ে কোপ দিয়ে আলাদা করে ফেলল মাথাটা।

কয়েকজন লোককে একসঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। এক বৌদ্ধ এসে তাদের শরীরে পেট্রোল ঢেলে দিল। আরেকজন আগুন ধরিয়ে দিল। চোখের পলকে ওদের চামড়া ঝলসে গেল। শরীর ছেঁকে গেল। ওদের ভয়াবহ চিৎকার শুনে বৌদ্ধরা হেসে একে অপরের গায়ে ঢলে পড়ল।

আরেকটা দৃশ্য দেখলাম, একটা শিশুকে বেয়নেট দিয়ে খোচাচ্ছে। কেঁদে উঠলেই চেপে ধরছে গলা। শিশুটির কান্না যখন অস্বাভাবিক বেড়ে গেল, একজন তার শরীরটা ধরে রাখল। আরেকজন দু'হাতে মাথাটা ধরে মুচড়ে দিল। হাড় ভাঙ্গার একটা ক্ষীণ শব্দ হল। চিরতরে কান্না থেমে গেল শিশুটির।

অপরাধ আমরা মুসলিম

মিয়ানমারের সংবিধান অনুযায়ী ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব থেকে যেসব জাতি-গোষ্ঠী এদেশে বসবাস করছে সবাই এদেশের নাগরিক। অথচ রোহিঙ্গারা হাজার বছর বসবাস করেও নাগরিকত্ব পায়নি। আরাকানের মোট জনসংখ্যার অধিকাংশই মুসলিম। লক্ষ লক্ষ মানুষের এ বিশাল জনগোষ্ঠীর যদি এদেশের নাগরিক হওয়ার অধিকার

না থাকে তাহলে অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী কিভাবে নাগরিক হওয়ার সুযোগ পেল?

স্বাধীন মিয়ানমারের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম 'শাওসোয়ে আইক' ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বলেছিলেন, রোহিঙ্গারা যদি স্থানীয় আদিবাসী না হয়, তাহলে আমিও তা নই। সত্যিই তো। মিয়ানমারের বর্তমান শাসকরাই বরং বহিরাগত। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে ওরা আরাকানে আসে। সেই বহিরাগত শাসকগোষ্ঠীই কিনা আজ হাজার বছর ধরে বসবারকারীদের নাগরিকত্ব বাতিল করেছে! মগের মুল্লুকে শুরু করেছে গণহত্যা। 'জোর যার মুল্লুক তার' একথার প্রয়োগক্ষেত্র আজ আরাকান।

সবকিছু দেখেও দেশের নির্বাচিত নেত্রী অং সাং সু চি ছিলেন পুরোপুরি নিশ্চুপ। কেনইবা তিনি চুপ থাকবেন না। তাকে ক্ষমতায় আনার পেছনে যে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিরাট অবদান রয়েছে; সেসব ভিক্ষুই আজ চাইছে রোহিঙ্গাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে।

২০১২ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনের দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল, সিত্তুইয়ের তরুণ ভিক্ষু সমিতি এবং ম্রাউকউ ভিক্ষু সমিতি বিবৃতির মাধ্যমে স্থানীয় বাসিন্দাদের আহ্বান জানিয়েছে, তারা যেন রোহিঙ্গাদের সহায়তা না করে। সু চি যে এসব উগ্রপন্থী ভিক্ষুদের সঙ্গে একমত তা ডিসেম্বর মাসেই প্রকাশ পেয়ে গেল। নিউইয়র্ক টাইমস সু চির বক্তব্য প্রকাশ করল– 'রোহিঙ্গারা বার্মার নাগরিক নয়; ওরা বাঙালী...। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এটি করা সরকারের দায়িত্ব।

সু চি ঠিকই বলেছেন। মিয়ানমারের সরকার আরাকানকে রোহিঙ্গামুক্ত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। এর আরেকটি প্রমাণ হল, মিয়ানমারে মুসলমানরা ছাড়াও আরো শতাধিক নৃগোষ্ঠী আছে। এসব নৃগোষ্ঠীকে জাতি ও রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করতে বিভিন্ন সময় সরকার তাদের সঙ্গে শান্তি-সমঝোতার আলোচনা চালিয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে রোহিঙ্গারা বরাবরই উপেক্ষিত হয়েছে। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে সাতটি গোষ্ঠীর সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে ১৮টি বিদ্রোহী সংগঠনের সদস্যরা একটি শান্তি সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়েছে। পক্ষান্তরে রোহিঙ্গাদের সঙ্গে সরকার কখনোই আলোচনায় বসার আগ্রহ দেখায়নি। চলমান এ পরিস্থিতিতে বিশ্বনেতারা নিছক দর্শক। তারা বিভিন্ন সময়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে নিজেদের দায়িত্ব আদায় করেছেন। অন্য কোন ধর্মের সংখ্যালঘুরা কোথাও নির্যাতিত হলে যাদের বুকে আগুন জ্বলে ওঠে, তারা আজ বিবৃতি দিয়েই ক্ষান্ত থাকছেন।

কফিআনানের নেতৃত্বে গত সেপ্টেম্বরে একটি কমিশন গঠন করা হয়েছিল। কমিশন রিপোর্ট পেশ করেছে, রাখাইন প্রদেশে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ঘটে গেছে। ব্যস! এ পর্যন্তই। কমিশনের কাজ কমিশন করেছে; রিপোর্ট দিয়েছে হায়! তাই বলে কি ব্যবস্থা গ্রহণ পাশ্চাত্যের শোভা পায়?

মুসলিম বিশ্বের অবস্থাও ভিন্ন কিছু নয়। শাসক নাগরিক সবাই নিজেদেরকে অসহায় মনে করছে। আরব বিশ্ব শোক প্রকাশ করেছে। মালয়েশিয়ার মত কেউ কেউ অবশ্য কিছুটা কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছে। কিন্তু শুধু মৌখিক কঠোরতা এসব হিংস্র বার্মিজদের টলাতে পারবে বলে মনে হয় না।

হবে, একটা কবরের জায়গা?

যতই দিন যাচ্ছে নিরাশা আমাকে ততই চেপে ধরছে। সহিংস বৌদ্ধদের হিংস্রতার সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। যেই আমি একসময় শত যুলুমের পরও এ মাটিকে আঁকড়ে থাকতে চেয়েছি, স্বজাতির অধিকার আদায়ে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করেছি, সেই আমার কাছেই এখন রোহিঙ্গাদের মুক্তি সুদূর পরাহত মনে হচ্ছে। ভয় হচ্ছে, বৌদ্ধ ভিক্ষুরা আমাদের শেষ রক্তবিন্দু পান করে তবেই দম নিবে।

আমি যে আশ্রয় শিবিরে আছি সেখানের সবাই তো বন্দী। এর বাইরে রাখাইনের অন্যান্য মুসলিমও কিন্তু নিরাপদ নয়। তাদের ঘাড়ের ওপর অহর্নিশ ঝুলছে মৃত্যুর পরোয়ানা।

জীবনের এই বেলাভূমিতে এসে আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। মন চাইছে সারা জীবনের ক্লান্তি শেষে কবরের শীতল বিছানায় একটু ঘুমাই।

তবে আমি চাই না আমার কবর এদেশে হোক। যে দেশের মাটি প্রতিনিয়ত আমার মুসলিম ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত হয়ে ওঠে, যালিমরা যেখানে নারীর ইজ্জত-আব্রু লুণ্ঠন করে পৈশাচিক উল্লাসে মেতে ওঠে, এমন দেশে আমি থাকতে চাই না। মৃত্যুর পরও এমন দেশে কবর হওয়ার কথা আমি ভাবতে পারি না।

জানি, ইতোমধ্যে বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছে আমার জাতির লাখ লাখ মানুষ। বিশেষ করে বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরে আছে অসংখ্য রোহিঙ্গা। কিন্তু আপনারাই বলুন, শরণার্থী হিসেবে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেয়া কি কোন সমাধান?

আমরা এটাও জানি, মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশে হাজার হাজার বর্গমাইল জায়গা খালি পড়ে আছে। সেসব দেশের শাসকদের সামান্য ইচ্ছাতেই ১৫ লক্ষ রোহিঙ্গা ইজ্জত-আব্রু নিয়ে বাঁচতে পারে। শুধু তাই নয়; তারা এক নববর্ষ উদযাপনের জন্য যে অর্থ ব্যয় করে তা দিয়ে রোহিঙ্গাদের জীবন অনায়াসে কেটে যাবে।

সবকিছু জানার পর এসব দাবী করে আমি লজ্জিত হতে চাই না। আমি শুধু একটা কবর পরিমাণ জায়গা চাই।

কেউ আমাকে গ্রহণ না করুক, মাটি তো আমায় ফিরিয়ে দেবে না। কারো জন্য বোঝা না হয়ে শান্ত মাটির বুকে আমি শুয়ে থাকব অনেকদিন। আছে কেউ, দেবে একটা কবরের জায়গা?

লেখক : শিক্ষার্থী, দাওয়া বিভাগ, মারকাযুদ্দাওয়া আল-ইসলামিয়া, হযরতপুর, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা

সোজা পথ ও বাঁকা পথ

কথিত এক খতীব সম্পর্কে

গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

বরাবর,
হযরত মুফতী সাহেব দা.বা.

১. আমাদের মসজিদের খতীব সাহেব কোন মাযহাব অনুসরণ করেন না। তিনি একজন লা-মাযহাবী লোক। বিভিন্ন সময়ে তিনি বিশ্ববরেণ্য উলামায়ে কেরামকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করেন। এমনকি চার মাযহাবের শ্রেষ্ঠ ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর ভুল ধরার মত সাহস দেখিয়েছেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর সরাসরি সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, ইমাম আবূ হানীফা রহ. একজন সাধারণ ব্যবসায়ী ছিলেন এবং দীর্ঘ দিন ফারসী ভাষায় নামায আদায় করেছেন।

২. কোন লা-মাযহাবী ইমামের পিছনে মাযহাব অনুসারী মুসল্লীগণের নামায হবে কিনা?

৩. চার মাযহাবের সংমিশ্রণ করা জায়েয কিনা?

৪. তিনি সফরে গেলে যোহর ও আসর নামায এবং মাগরিব ও ইশার নামায একসাথে পড়েন এবং অন্যদেরকেও একসাথে পড়ার পরামর্শ দেন। এভাবে নামায আদায় করা জায়েয হবে কি?

৫. বিতর নামায কত রাকাআত? খতীব সাহেব নিজে বিতর নামায এক রাকাআত আদায় করেন এবং মুসল্লীদেরকেও এক রাকাআত নামায আদায় করার পরামর্শ দেন। মসজিদে এক রাকাআত বিতর নামায প্রচলন করার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

৬. বর্তমান খতীব মসজিদে হালাল টাকা দান করার কথা বলেন। আবার তিনি নিজেই চলচ্চিত্র অভিনেতার নিকট থেকে টাকা নিয়ে মসজিদের জন্য জায়নামায ক্রয় করেন। এটা জায়েয হবে কি?

৭. মহিলাদের মসজিদে এসে রমাযান মাসের ই'তিকাফ (শেষ দশদিন) করা জায়েয আছে কি?

৮. জুমু'আ, তারাবীহ এবং ঈদের নামায মহিলাদের মসজিদে এসে জামাআতের সহিত আদায় করা জায়েয আছে কি?

অনুগ্রহপূর্বক উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর কুরআন এবং হাদীসের আলোকে প্রদান করে বাধিত করবেন।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর

অবৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ অবৈধ ও হারাম। আর বর্তমান চলচ্চিত্র নির্মাণে যে কোনভাবে অংশগ্রহণ করা যে বেহায়াপনার কাজে অংশগ্রহণ এতে কোন বিবেকবানের সন্দেহ থাকার কথা নয়। সুতরাং চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদও অবৈধ ও হারাম হবে। আর জেনে শুনে হারাম সম্পদ থেকে দান গ্রহণ করাও হারাম। হারাম টাকায় ক্রয় করা জায়নামাযে যারা নামায পড়বে হাদীসের ভাষ্য মতে তাদের নামায কবুল হবে না।

হ্যাঁ, কেউ যদি হারাম পেশা থেকে তওবা করে হারাম আয়ের দায় থেকে মুক্ত হতে চায়, তাহলে তার পদ্ধতি হল, সওয়াবের নিয়ত না করে হারাম অর্থ-সম্পদ কোন গরীব মিসকীনকে কিংবা মসজিদ-মাদরাসার টয়লেট নির্মাণের কাজে দান করে দিবে। প্রশ্নে উল্লিখিত ক্ষেত্রে এর কোনটিই বিদ্যমান নয়। কাজেই প্রশ্নে উল্লিখিত অভিযোগ বাস্তবসম্মত হলে আলোচ্য খতীব সাহেব হাদীস-মাসআলা সম্পর্কে অজ্ঞ এবং মুসল্লীদের নামাযের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হবেন।

দলীলসমূহ

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا مُطَرِّحٌ أَبُو الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْمُغَنِّيَةِ، وَلَا بَيْعُهَا، وَلَا شِرَاؤُهَا، وَلَا الِاسْتِمَاعُ إِلَيْهَا

অর্থ : হযরত উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, গায়িকার উপার্জন এবং তার ক্রয়-বিক্রয় ও তার থেকে গান শোনা (সবকিছুই) হারাম। (মুসনাদে হুমাইদী; হা.নং ৯৩৪)

عَنْ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ، لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً مَادَامَ عَلَيْهِ

অর্থ : হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দশ দিরহাম দ্বারা একটি কাপড় ক্রয় করল। এর মধ্যে যদি একটি দিরহামও হারাম থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার কোন নামায কবুল করবেন না; যতক্ষণ পর্যন্ত সে কাপড় তার পরিধানে থাকবে। (মুসনাদে আহমদ; হা.নং ৫৭৩২, শুআবুল ঈমান; হা.নং ৫৭০৭)

সপ্তম প্রশ্নের উত্তর

শরীয়তের বিধান মতে মহিলাদের জন্য ই'তিকাফ করা সুন্নাতে মুআক্কাদা নয়; বরং নফল। এদিকে নবীজীর ভাষ্য অনুযায়ী মহিলাদের জন্য নামাযের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও ঘরে আদায় করা অধিক সওয়াবের কাজ, এজন্য তারা বিনা প্রয়োজনে মসজিদে গিয়ে নামায পড়বে না। সুতরাং মহিলাদের জন্য ই'তিকাফ করতে মসজিদে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত বিবিগণ নিজ নিজ ঘরেই ই'তিকাফ করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে একবার তাদের দু'জন মসজিদে ই'তিকাফ করার আয়োজন করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দেন এবং নিজেও সে রমাযানের ই'তিকাফ বাতিল করে দেন। অতঃপর শাওয়াল মাসে তার কাযা করে নেন।

হাদীসটি সহীহ বুখারীর আরবী সংস্করণের ২০৩৩ নম্বরে এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে অনুবাদকৃত সহীহ বুখারীর ১৯০৫ নম্বরে লিপিবদ্ধ আছে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْتَكِفُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ، فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً، فَأَذِنَتْ لَهَا، فَضَرَبَتْ خِبَاءً، فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الأَخْبِيَةَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَأُخْبِرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْبِرَّ تُرَوْنَ بِهِنَّ فَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ

অর্থ : হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রমাযানের শেষ দশকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই'তিকাফ করতেন। আমি তাঁর তাঁবু তৈরি করে দিতাম। তিনি ফজরের নামায আদায় করে তাতে প্রবেশ করতেন। (নবী-সহধর্মিণী)

হাফসা রাযি. তাঁবু খাটানোর জন্য আয়েশা রাযি. এর কাছে অনুমতি চাইলেন। হযরত আয়েশা রাযি. অনুমতি দিলে তিনি আরেকটি তাঁবু তৈরি করলেন। তাঁর দেখাদেখি হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ রাযি.ও একটি তাঁবু তৈরি করলেন। সকালে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁবুগুলো দেখলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এগুলো কী? তাঁকে জানানো হলে তিনি বললেন, তোমরা কি মনে করো এগুলো দ্বারা নেকী হাসিল হবে? অনন্তর এ মাসে তিনি ই'তিকাফ ত্যাগ করলেন এবং শাওয়াল মাসে দশদিন (কাযা স্বরূপ) ই'তিকাফ করেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৯০৫)

এ হাদীসের আলোকে সহজেই অনুমেয় যে, খতীব সাহেব তার মুসল্লীদেরকে সঠিক পথ থেকে কতটা বিভ্রান্ত করে চলেছেন?

অষ্টম প্রশ্নের উত্তর

সূরা আহযাবের ৩৩ নম্বর আয়াতের নির্দেশনা অনুযায়ী মহিলাদের জন্য সাধারণ অবস্থানস্থল হল তাদের ঘর। শরঈ কিংবা মানবিক প্রয়োজন ছাড়া ঘরোয়া পরিবেশের বাইরে যাওয়া পর্দা রক্ষা করে হলেও জায়েয নেই। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুযায়ী মহিলাদের জন্য ঘরে নামায পড়া মসজিদে পড়ার চেয়ে অনেকগুণ বেশি সওয়াবের কাজ।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: خَيْرُ مَسَاجِدِالنِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ

অর্থ : হযরত উম্মে সালামা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মহিলাদের নামাযের সর্বোত্তম স্থান হল ঘরের ভেতরের নির্জন স্থান। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২৬৫৪২, সহীহ ইবনে খুযাইমা; হা.নং ১৬৮৩, সুনানে কুবরা; হা.নং ৫৩৬০)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মহিলাদের যে নামায ঘরের অভ্যন্তরে পড়া হয় তা ঘরের আঙ্গিনায় আদায়কৃত নামাযের তুলনায় উত্তম এবং ঘরের ভেতরের ছোট কামরায় আদায়কৃত নামায ঘরের অভ্যন্তরে (বড় কামরায়) আদায়কৃত নামাযের তুলনায় উত্তম। (অর্থাৎ যে নামায যত বেশি গোপনীয়তার সাথে আদায় করা হবে সে নামায তত বেশি ফযীলতপূর্ণ হবে।) (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৫৭০)

মুস্তাদরাকে হাকিম নামক কিতাবে এই হাদীসটিকে ইমাম বুখারী রহ. ও ইমাম মুসলিম রহ.এর হাদীস সংকলনের নীতিমালা ও শর্তাবলী সমৃদ্ধ সহীহ বলা হয়েছে।

পক্ষান্তরে গোটা হাদীস ভাণ্ডারে এমন একটি বর্ণনাও পাওয়া যাবে না যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের জন্য পুরুষদের জামাআতে অংশগ্রহণ করে নামায পড়লে বেশি সওয়াব প্রাপ্তির কথা বলেছেন কিংবা পুরুষদেরকে বলেছেন যে, তোমরা মহিলাদেরকে মসজিদে নিয়ে এসো। আর কোন কোন বর্ণনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যুগে মহিলাদের জন্য মসজিদে গমনের যে অনুমতির কথা পাওয়া যায়, তা শর্তহীন ছিল না বরং শর্তসাপেক্ষ ছিল । তাছাড়া সে যুগ যেহেতু ফিতনা-ফাসাদ মুক্ত ছিল এবং নামায-রোযার নিত্যনতুন মাসআলা সকলেরই জানার প্রয়োজন ছিল। উপরন্তু কাফেরদেরকে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য দেখানোও উদ্দেশ্য ছিল এ সকল কারণে সে যুগে কোন মহিলা স্বেচ্ছায় মসজিদে আসতে চাইলে তার অনুমতি ছিল। তা সত্ত্বেও স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে যুগেও মহিলাদেরকে নিজ নিজ ঘরে নামায আদায় করতে উৎসাহিত করেছেন এবং তাদের জন্য ঘরে আদায়ের অধিক ফযীলতের কথা ঘোষণা করেছেন। তদুপরি নবী-পরবর্তী সময়ে সাহাবায়ে কেরামের যুগে বিজ্ঞ সাহাবীগণ মহিলাদেরকে মসজিদে আসতে একেবারে নিষেধই করে দিয়েছেন। বর্ণিত আছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রাযি. পাথরকণা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মহিলাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দিতেন। হযরত আবূ আমর শায়বানী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

رأيت ابن مسعود يقوم يحصب النساء يوم الجمعة يخرجهن من المسجد.

অর্থ : আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি.কে জুমু'আর দিন দাঁড়িয়ে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মহিলাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দিতে দেখেছি। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ৭৬১৭, হাদীসটি সহীহ)

হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَوَمُنِعْنَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ

অর্থ : বর্তমানে মহিলারা যে রূপ সাজসজ্জা শুরু করেছে তা যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যক্ষ করতেন, তাহলে অবশ্যই তাদেরকে মসজিদে যাওয়া থেকে এমনভাবে নিষেধ করে দিতেন যেমন নিষেধ করে দেয়া হয়েছিল বনী ইসরাঈলের মহিলাদেরকে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৮৬৯, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৪৪৫)

এখন বলুন! সাহাবায়ে কেরামের কল্যাণযুগেই যদি মহিলাদের জন্য মসজিদে, জামা'আতে, জুম'আয় ও ঈদে শরীক হওয়া খোদ সাহাবায়ে কেরামের মতে অপছন্দনীয় হয় তাহলে আমাদের যুগে তা পছন্দনীয় হবে, এটা কোন বিবেকবান ব্যক্তির কথা হতে পারে? এ যুগে যে বা যারা মহিলাদেরকে মসজিদে আসার জন্য কিংবা জুম'আয় ও ঈদে (যা মহিলাদের জন্য ওয়াজিবই নয়) শরীক হতে উৎসাহ দিচ্ছে সে বা তারা কি হযরত আয়েশা রাযি. ও হযরত ইবনে মাসঊদ রাযি. এর চেয়ে দীন বেশী বুঝে? এবং আমরা কি তাদের অনুসরণ করবো? অথচ মুক্তি পেতে হলে আমাদেরকে তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাগণের নীতির উপর অটল থাকতে হবে।

মোটকথা, প্রশ্নোক্ত অভিযোগগুলো বাস্তব হলে অভিযুক্ত খতীব একজন উগ্র কিসিমের লা-মাযহাবী; আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বহির্ভূত, আকিদাগত ও কর্মগত ফাসিক, ফিতনাবাজ ও অসৎ আলেমদের দলভুক্ত। তার ইমামতি মাকরূহে তাহরীমী এবং তার পেছনে ইক্তিদা করাও মাকরূহে তাহরীমী। কর্তৃপক্ষের জন্য অবশ্য করণীয় হল, এমন খতীবকে অব্যাহতি দিয়ে কোন মুত্তাকী, পরহেযগার ও বিজ্ঞ আলেমে দীনকে খতীব হিসেবে নিয়োগ দেয়া। অন্যথায় মুসল্লীদের নামায নষ্ট হওয়ার সকল দায়ভার কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে গোমরাহীর সকল পথ বর্জন করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

তালিবুল ইলম সন্তানের জন্য আপনারও আছে কিছু করণীয়!

মাওলানা সা'দ আরাফাত

আদর্শ সন্তান প্রত্যেক বাবা-মায়েরই স্বপ্ন। আর স্বপ্ন যদি হয় আলেম সন্তানের, তবে সেই স্বপ্নের তুলনা হয় না। কিন্তু বাস্তবতা হলো, স্বপ্ন যত বড় হয় তার বাস্তবায়নও তত কঠিন হয়ে থাকে। তবে যেহেতু অভিভাবকমাত্রই সহযোগী তাই স্বপ্ন পূরণের সাধনায় অভিভাবকের অধিকাংশ করণীয় সহযোগিতামূলক। এক্ষেত্রে সন্তানের প্রয়োজন এবং চাহিদা অনুযায়ী অভিভাবকের ফরয দায়িত্ব হলো, সন্তানের এমন বিষয়গুলোতে সহযোগিতা করা যা তার পক্ষে একাকী সমাধা করা সম্ভবপর হয় না।

উম্মতের ভবিষ্যত কর্ণধার হওয়ার মহান সাধনায় যে তালিবুল ইলম আত্মনিয়োগ করে, চলার পথে তাকে অসংখ্য বাধাবিপত্তি ও চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করতে হয়। এজন্য শিক্ষাজীবনের প্রারম্ভ থেকে অভিভাবক যদি সন্তানের চলার পথে শৈশবের মতো 'হাতে ধরা' সঙ্গী হয়ে থাকেন তবে তার পড়ে যাওয়ার কিংবা থেমে যাওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। বরং যে দুস্তর-কঠিন পথে সন্তানকে অভিভাবক এগিয়ে দিয়েছেন সে পথের বাধা-বিঘ্ন দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা করা অভিভাবকের জন্য অবশ্যকরণীয় দায়িত্ব। তা না করে সন্তানকে নিঃসঙ্গ ছেড়ে দেয়া এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে তার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ানো ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তো বটেই, সামাজিক দৃষ্টিতেও পিতৃত্বের পরিপন্থী আচরণ। আমরা মূলত আলোচনা করবো এমন কিছু সমস্যা ও অপূর্ণতার ব্যাপারে, যেগুলোর সমাধান কিংবা অভাব মোচন করা অভিভাবকের সঙ্গ ছাড়া একাকী তালিবুল ইলমের পক্ষে পর্বতপ্রমাণ কঠিন হয়ে থাকে।

একজন তালিবুল ইলমের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। সময়ের ভিন্নতায় প্রয়োজনের এই বিভিন্নতা অনুধাবন করে সন্তানের তত্ত্বাবধান করলে সন্তানের জন্য পথচলা সহজ হয়ে যায়। সে হিসেবে অভিভাবকের সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোকে মোটামুটি চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়-

এক. মাদরাসায় ভর্তির পূর্বে।
দুই. সন্তান যখন মাদরাসায়।
তিন. শিক্ষাকালীন ছুটিতে।
চার. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনের পর।

এক. শিক্ষার শুরু মাতাপিতার কোলে-পিঠে

অনেকেই মনে করেন, সন্তানকে মাদরাসায় ভর্তি করার পর তার উস্তাদগণই তাকে মাদরাসার লেখাপড়া ও পরিবেশের উপযুক্ত করে নিবেন। এজন্য তারা ভর্তিপূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন বোধ করেন না। ফলে মাদরাসায় ভর্তির পরও তাদের সন্তান কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পায় না। এমনকি উস্তাদ ও পিতা-মাতাও তালিবে ইলমকে গড়ে তোলার আবশ্যিক কার্যক্রমে মনোযোগী হওয়ার পরিবর্তে নানান সমস্যা মোকাবেলায় অস্থির ও পেরেশান থাকেন।

এজন্য মাদরাসায় ভর্তি করার আগে থেকেই জেনে নেয়া উচিত যে, সন্তানকে মাদরাসায় ভর্তির উপযুক্ত করে দিতে এবং ভর্তির পর তার শিক্ষা-দীক্ষার গতি বেগবান করতে এ সময়ে অভিভাবকের কী কী করণীয় আছে।

অভিভাবক ও পরিবারের প্রস্তুতি

মাদরাসা-ছাত্রদের অধিকাংশ অভিভাবকের আচরণ-উচ্চারণ দেখে মনে হয়, তাঁরা শিক্ষককে সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার ও তাদের চরিত্রগঠনের একমাত্র যিম্মাদার মনে করেন। অথচ এই দায়িত্ব প্রথমত ও প্রধানত অভিভাবকের। কর্মক্ষেত্রের ব্যস্ততা, সাংসারিক দায়িত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে এই কাজের জন্য সন্তানকে শিক্ষকের হাতে ন্যস্ত করলেও তার শিক্ষাজীবনের সব পর্যায়ে এ ব্যাপারে মূল চিন্তা অভিভাবককেই করতে হবে। সুতরাং প্রধানতম দায়িত্বশীল হিসেবে আলেমসন্তান গঠনের নির্ভুল চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনার জন্য এবং সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য অভিভাবকের চলাফেরা ও জীবনযাপন পদ্ধতিতে তাকওয়া ও দীনদারীর পূর্ণ অনুসরণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে, প্রতিটি শিশু ছয় মাস থেকে ছয় বছর বয়সকালের মধ্যেই তার সমগ্র জীবনের চর্চিতব্য স্বভাবগুলো আয়ত্ব করে ফেলে। এগুলোর অধিকাংশই সে বাবা-মা, ভাই-বোন এবং প্রতিবেশী শিশুদের আচার-আচরণ, কথাবার্তা ইত্যাদি দেখে দেখে বা অনুভব করে শেখে। এ সময়ে ভালোমন্দের বিচারশক্তি না থাকায় শিশুরা অনুকরণ-প্রবণতায় সবকিছুই শিখতে এবং করতে ভালোবাসে। প্রতিটি শিশুর কচি মন স্বচ্ছ আয়নার মতো। বুঝতে শেখার বয়স থেকে যে কথা বা কাজগুলো তার মনে দাগ কাটে সেগুলো মনে স্থায়ীভাবে থেকে যায়। ফলে জীবনের বাকী সময়ে সে এই আচরণগুলো অনুশীলন ও প্রকাশ করতে ভালোবাসে। এমনকি এই বয়সের শেখা ভুল আচরণ ছাড়তেও সে পরবর্তীতে আর প্রস্তুত থাকে না। হাদীসের ভাষ্যমতে, প্রতিটি শিশু নির্মল ও বিশুদ্ধ স্বভাব নিয়েই জন্ম নেয়। কিন্তু ধীরেধীরে অভিভাবকের কারণেই তার স্বভাবে নানা রকম পঙ্কিলতা বাসা বাঁধে। এই বাস্তবতায় সন্তানের নির্মল মানস গঠন ও সাফল্যময় জীবনের জন্য সন্তানের জন্মের পর থেকেই, বরং আরো আগে থেকে অভিভাবকের প্রস্তুতি গ্রহণ করা জরুরী। এক্ষেত্রে আলেমসন্তানের সৌভাগ্যবান পরিবার হবার প্রস্তুতিস্বরূপ নিজেদের মধ্যে মোটাদাগে এই পরিবর্তনগুলো আনতে হবে-

১. সন্তানের বাবা এবং গর্ভধারিণী মা উভয়ে যেন দীনদার হন। বিশেষত গর্ভধারণ-কালীন সব ধরনের গুনাহ থেকে বেঁচে পরহেযগারী অবলম্বন করা জরুরী।

২. বাবা-মাসহ পরিবারের সকল সদস্য নিয়মিত দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে সময় লাগিয়ে, দীনী কিতাবপত্র পাঠ করে, দীনী মজলিস-মাহফিলে শরীক হয়ে বিশেষত উলামায়ে কেরামের সঙ্গে ব্যক্তিগত দীনী সম্পর্ক তৈরি করে দীনচর্চায় পূর্ণ অভ্যস্ত হওয়া।

৩. ঘরকে বদদীনী ও গুনাহের সমস্ত আসবাব থেকে পবিত্র করে তাকওয়া ও দীনদারীর পরিমণ্ডল তৈরি করা।

৪. ঘরে নির্দিষ্ট সময়ে কুরআন তিলাওয়াত, আম্বিয়ায়ে কেরাম আ. সাহাবায়ে কেরাম রাযি. ও আকাবিরে দীনের জীবনী, ফাযাইল ও মাসাইলের তা'লীমের পাশাপাশি এ জাতীয় কিতাবাদি অধ্যয়নের পরিবেশ গড়ে তোলা।

৫. যে সকল বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন দীনদারী উপেক্ষা করে চলেন তাদের

থেকে পারিবারিকভাবে দূরত্ব বজায় রাখা।

৬. সমপর্যায়ের কিংবা আরো ভালো দীনদার পরিবারের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব গড়ে তোলা এবং এমন ঘরে নিয়মিত যাতায়াত ও তাদের নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করা।

এভাবে ঘর ও পরিবারকে নূরানী তরীকায় গড়ে তুললে এবং বেপর্দেগীসহ যাবতীয় বদদীনী ও গুনাহের পরিবেশ দূর করলে সন্তান মাদরাসায় গিয়ে প্রতিষ্ঠানের পরিবেশকে আপন মনে করতে পারে। অন্যথায় বে-দীনী ও গুনাহের পরিবেশ থেকে আসা সন্তান মাদরাসার পরিবেশকে আপন করে নিতে পারে না। এমনকি মাদরাসার শিক্ষা ও দীনদারীকে চাপ ও বোঝা মনে করে উপেক্ষা করার চেষ্টা করে। এটা একজন আলেম বা তালিবুল ইলমের জন্য কতটা ক্ষতিকর তা বিজ্ঞমাত্রই বোঝেন।

সন্তানের মানসিক ও অনুশীলনমূলক প্রস্তুতি

যেহেতু ইলমে দীন অর্জন জীবনের বৃহত্তম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য, তাই জন্মের পর থেকেই সন্তানের পড়ালেখার ব্যাপারে চিন্তাশীল হওয়া এবং তাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তোলা চাই। বিচক্ষণ ও দূরদর্শী পিতামাতা খেলাধুলার বয়স থেকেই সন্তানকে কিছু কিছু করে পড়ালেখা শেখার প্রতি মনোযোগী করেন। এতে সন্তান শিক্ষা-দীক্ষাকে ছোট থেকেই ভালোবাসতে শেখে এবং স্বপ্ন দেখে শিক্ষাজীবনে মেহনত করে বিশ্ববরেণ্য উলামায়ে কেরামের উত্তরসূরী হওয়ার। ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সে হয় উস্তাদ ও অভিভাবকের সাধ ও সাধনার সহযাত্রী। বরং আশৈশব লালিত স্বপ্নের আবেশে উচ্চাভিলাষী ভবিষ্যতের আশায় শিক্ষাজীবনে কোনো কঠিনতম সিদ্ধান্ত নিতেও সে দ্বিধান্বিত হয় না।

কাজেই মাদরাসায় ভর্তির পূর্বে সন্তানকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার গুরুত্ব অনেক বেশি। উপরে আলোচিত পদক্ষেপগুলোর উপর পরিপূর্ণ আমল করলে সন্তান ইনশাআল্লাহ মানসিকভাবে অনেকটা প্রস্তুত হয়ে যাবে। এছাড়াও মাদরাসায় ভর্তি করার দু-এক বছর আগে থেকে আরো সুনির্দিষ্ট প্রস্তুতি নেয়া দরকার। সন্তানকে আগ্রহী করে তুলতে এই কাজগুলো ফলপ্রসূ হবে, ইনশাআল্লাহ-

১. পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর এবং প্রতিটি দু'আ কবুলের সময় আল্লাহ তা'আলার কাছে কাকুতি মিনতি সহকারে আর্জি করা, যেন তিনি সন্তানকে উম্মতের ইমাম ও রাহবার হিসেবে এবং আকাবিরে দীনের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে কবুল করেন। কেননা তিনিই সন্তানের মন ও মানসিকতার নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন করেন।

২. খেলাধুলার মাঝেই ইলমে দীন অর্জনের গুরুত্ব ও ফযীলত, আহলে ইলমের মর্যাদা ও দায়িত্ব, সমাজসংস্কারক উলামায়ে কেরামের জীবনী ও ইতিহাস, কওমী মাদরাসার পরিচয় ও প্রকৃতি ইত্যাদি তাকে গল্পে গল্পে শোনাতে থাকা। এভাবে তার মনে ইলমে দীন ও উলামায়ে উম্মতের প্রতি মহব্বত ও টান তৈরি হবে।

৩. উল্লিখিত বিষয়বস্তুর ওপর লেখা ছোটদের উপযোগী বইপত্রের ব্যাপারে উৎসাহিত করে এগুলো তাকে পড়তে দেয়া। এতে ইলম অর্জনে আগ্রহী হওয়ার পাশাপাশি বই পাঠের অভ্যাস গড়ে উঠবে, যা পরবর্তী জীবনে কাজে লাগবে।

৪. সন্তানকে নিয়ে মাসে দু-একবার আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দীনের মজলিসে-মাহফিলে ও তাদের সান্নিধ্যে যাওয়া এবং তাঁদের পরামর্শ ও নসীহত শোনা। এমনিভাবে মাঝেমধ্যে বিভিন্ন মাদরাসা ঘুরিয়ে মাদরাসার পরিবেশের সঙ্গে আন্তরিকতা ও আত্মীয়তা তৈরি করা। এভাবে দীনী মজলিস ও মারকাযে যাতায়াতের ফলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহওয়ালাদের ফয়য ও বরকতে তার মধ্যে দীনের প্রতি আসক্তি বাড়বে।

৫. নিজ দায়িত্বে এলাকার মাদরাসাপড়ুয়া ভদ্রস্বভাবের আমলদার ছাত্র খুঁজে বের করে সন্তানকে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতা গড়ে তোলার প্রতি উৎসাহিত করা ও সুযোগ করে দেয়া। এতে সে মাদরাসায় যাতায়াত শুরু করার আগেই মাদরাসাকে নিজের আপন ঠিকানা ভাববে এবং মাদরাসায় যেতে উদ্বুদ্ধ হবে।

৬. যেসকল প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজন দীনচর্চা ও দীনশিক্ষার ব্যাপারে অবহেলা করেন তাদের সন্তানদের সঙ্গে এবং দুষ্টমতি অসচ্চরিত্র বাচ্চাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও চলাফেরা নিষিদ্ধ করা। এ ব্যাপারে অভিভাবকের সামান্যতম অবহেলাও সন্তানকে বিপথে নিয়ে যেতে পারে।

৭. টেলিভিশন দেখা, রেডিওর নাজায়েয ও বেহুদা অনুষ্ঠান শোনা, কম্পিউটার বা মোবাইলে নাজায়েয অডিও-ভিডিও দেখা বা শোনা, হারাম ও মিথ্যা গল্প-উপন্যাস পড়া, রাস্তাঘাটে বা পাড়ামহল্লায় বে-দীন ফাসেকদের বেহুদা আড্ডা-তামাশা দেখা এবং এ জাতীয় অনর্থক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করা ও এগুলোর ক্ষতি ও কুপ্রভাব শুনিয়ে এগুলো থেকে মানসিকভাবে দূরত্ব তৈরি করা। এই সবগুলো বিষয় মানুষকে গোমরাহ করার জন্য শয়তানের শক্তিশালী মাধ্যম। এগুলোর ব্যাপারে সতর্ক করে না দিলে সন্তান ধীরে ধীরে লাইনচ্যুত হয় এবং পড়ালেখার প্রতি নিস্পৃহ হতে থাকে।

৮. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরুর প্রস্তুতিস্বরূপ ঘরেই পিতামাতার তত্ত্বাবধানে প্রতিদিন দেড়-দুই ঘণ্টা করে পড়ালেখা করানো। অভিভাবক নিজে সময় দিতে না পারলে গৃহশিক্ষক রেখে হলেও এই চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলা, ইংরেজি, আরবী ভাষার শিশুশিক্ষার স্তরগুলো, আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বই নাম (ব্যাখ্যাসহ), ইসলামের কালিমাসমূহ, ছোট ছোট কিছু সূরা, উপদেশ ও ফযীলত বিষয়ক হাদীস, প্রাত্যহিক কাজসমূহের সুন্নাত তরীকা ও মাসনূন দু'আ (আমলের অভ্যাসসহ), প্রসিদ্ধ আম্বিয়ায়ে কেরাম আ. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী, বড় বড় ফেরেশতাগণের নাম ও অবস্থা, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম তথা পরকালের চিত্র ও অবস্থা ইত্যাদি শেখানোর ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া চাই। এতে একদিকে ঘরে থাকা অবস্থায়ই সন্তান প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-দীক্ষায় অভ্যস্ত হবে, অপরদিকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পর্যায়ে গিয়ে মাদরাসাকে নিজ ঘরের মতো ভাবতে পারবে।

মোটকথা, মাদরাসায় ভর্তির পূর্বে সন্তানকে ইলমে দীনের প্রতি আগ্রহী করার জন্য প্রয়োজনীয় সব চেষ্টা করা এবং ইলমে দীন অর্জনে অনাগ্রহ সৃষ্টিকারী সবধরনের কাজ থেকে তাকে বিরত রাখা জরুরী। মাদরাসা-শিক্ষার প্রাথমিক স্তরগুলোতে অনেক তালিবে ইলম এমন পাওয়া যায়, কুরআন-হাদীসের ইলম অর্জন করার ব্যাপারে যাদের কোনো আগ্রহ নেই। এমনকি বিপরীতমুখী শিক্ষার প্রতি আগ্রহী ছাত্রকেও মাদরাসায় জোর করে ভর্তি করে দেয়ার দৃষ্টান্ত আছে। এই ছাত্ররা পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে আগ্রহী ও মনোযোগী হতে পারে সত্য; কিন্তু প্রাথমিক স্তরের ভিত্তিমূলক শিক্ষায় এদের যে দুর্বলতা থেকে যায় এটা নিঃসন্দেহে তাকে পরবর্তী স্তরগুলোতে ভোগায়। এজন্য বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের মতে, মাদরাসায় ভর্তি করার

পূর্বে সন্তানের মানসিক অবস্থা ও তার প্রস্তুতির ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া উচিত।

সেরা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন

পারিবারিক পরিচর্যায় সন্তানকে মনোযোগী ও আমলদার তালিবে ইলম হিসেবে গড়ে তোলার পর তার পরবর্তী শিক্ষাজীবনের জন্য অন্তত এমন একটি বিদ্যাপীঠ প্রয়োজন, যেন পারিবারিক ঐতিহ্য ও উন্নত পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা ফুলকলি-তুল্য সন্তান অন্তত পরিবারের মতো হৃদয়বান ও দরদী আসাতিযায়ে কেরামের সযত্ন পরিচর্যা পেয়ে পূর্ণ বিকশিত ও প্রস্ফুটিত হতে পারে। এজন্য সন্তানকে শ্রেষ্ঠতম আলেম হিসেবে গড়তে যথাযথ ও মানসম্মত শিক্ষা-দীক্ষার জন্য আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠের সন্ধান ও বাছাই করা সর্বাধিক জরুরী। অন্যথায় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাব্যবস্থা ত্রুটিযুক্ত ও অবহেলাপূর্ণ হলে ইলমে দীনের রাজপথে সফলতা লাভের জন্য তালিবে ইলমের সর্বোচ্চ চেষ্টা-সাধনা কিংবা পরিবারের যারপরনাই চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনাও কোনো কাজে আসবে না। কওমী মাদরাসাসমূহের বহু তালিবে ইলম এখনো এমন আছে, যারা তাদের শিক্ষাজীবনের সূচনায় অভিভাবককৃত অবহেলার ফল প্রতিনিয়ত ভোগ করে যাচ্ছে। এজন্য শুরুতেই এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সন্তানের পড়ালেখার ঠিকানা হিসেবে নির্বাচন করা উচিত যেখানে শিক্ষার্থীদের আমলদার আলেম বানিয়ে উম্মতের কাছে তাদের যোগ্য রাহবার হিসেবে পাঠানো হয়।

মানসম্মত ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচন করতে এই বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য করা যেতে পারে-

১. সফলতম আলেমে দীন গড়ার পূর্বশর্ত হলো, যোগ্য ওয়ারিসে নবীর জন্য অপরিহার্য এই চারটি গুণ প্রতিটি তালিবে ইলমের মধ্যে বাস্তবায়ন করা-

(ক) বিশুদ্ধতা ও গভীরতার সাথে বিপুল ইলম অর্জন, (খ) ফাযাইল ও মাসাইলের অর্জিত ইলম অনুযায়ী পুঙ্খানুপুঙ্খ আমল, (গ) তাযকিয়া তথা চারিত্রিক দোষত্রুটি সংশোধন করে পবিত্রতম পুণ্যচরিত্র অর্জন এবং (ঘ) দাওয়াত তথা সমাজে উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের (ইলম, আমল ও তাযকিয়া) ব্যাপক প্রচার ও প্রচলনের সার্বক্ষণিক ফিকির।

যে প্রতিষ্ঠানে এই চারটি গুণের অধিকারী তালিবে ইলম গড়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয় সেটিই শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে গণ্য হতে পারে।

২. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য শিক্ষার্থীদের সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে অনেক বেশি অবদান রাখে। যেমন উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, আইন-কানুনের যথার্থ ও পূর্ণ প্রয়োগ, সার্বক্ষণিক শিক্ষক-তত্ত্বাবধান, রাজনীতি ও দলাদলিমুক্ত পরিবেশ ইত্যাদি। কাজেই সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার আদর্শ ঠিকানা নির্বাচনে এ ধরনের বিষয়গুলোও লক্ষ্য করা উচিত।

৩. যে সকল তালিবে ইলম তাদের আসাতিযায়ে কেরামকে বিপুল ইলমের অধিকারী, শ্রেষ্ঠতম মুত্তাকী ও সর্বাধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পায় এবং তাঁদের নিরবচ্ছিন্ন সান্নিধ্য ও তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠে তারা পরবর্তীতে ব্যতিক্রমী যোগ্যতাসম্পন্ন আলেম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। কাজেই সন্তানের জন্য এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী আসাতিযায়ে কেরামের সন্ধান করলে সন্তানের গুণ ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে তাঁদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনেক বেশি ভূমিকা রাখতে পারে।

৪. সন্তানের সহপাঠী এবং প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়ালেখার প্রতি অদম্য স্পৃহা, বিপুল উদ্যম, গভীর মনোনিবেশ ও সর্বোচ্চ মেহনত ইত্যাদি গুণের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যেতে পারে। কারণ, সহপাঠীদের মধ্যে এই গুণগুলোর সমাবেশ না ঘটলে সন্তানও এগুলোর অভাবে সর্বোচ্চ যোগ্যতা নিয়ে গড়ে উঠবে না।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-দীক্ষাকে সর্বোচ্চ কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য সন্তানকে মাদরাসায় দেয়ার পূর্বে সম্ভব হলে অভিভাবক নিজেই বিভিন্ন স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরেজমিন ঘুরে দেখবেন এবং উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য চতুষ্টয়ের উপস্থিতি যাচাই করবেন। তবে সম্ভব না হলে অবশ্যই বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম কিংবা কোনো তালিবে ইলমের চিন্তাশীল ও দূরদর্শী অভিভাবকের সঙ্গে পরামর্শ করে হলেও সন্তানের ইলমে দীন অর্জনের জন্য শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ নির্বাচন করবেন। আল্লাহ না করুন, অভিভাবকের অবহেলা কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ত্রুটিতে কোনো তালিবে ইলমের শিক্ষাজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হলে আল্লাহ তা'আলার কাছে এর জবাবদিহি করতে হবে।

দুই. দৃষ্টির আড়ালে, মাদরাসায়

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-দীক্ষার পর্যায়ে এসে সন্তানের পড়ালেখার যিম্মাদারীতে পিতা-মাতার সঙ্গে আসাতিযায়ে কেরামও যুক্ত হন। কাজেই এ সময় থেকে উস্তাদ ও অভিভাবক- উভয়পক্ষই তালিবে ইলম গড়ার যৌথ দায়িত্বশীল। সন্তানের তা'লীম-তরবিয়তের ব্যাপারে এখন থেকে উভয়পক্ষ পারস্পরিক পরামর্শ ও সহযোগিতার ভিত্তিতে স্বীয় সুনির্দিষ্ট দায়িত্বপালন করবেন। বলাবাহুল্য, এক্ষেত্রে উভয়পক্ষের যৌথ পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধান সন্তানের মানসগঠনে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করে। পক্ষান্তরে আসাতিযায়ে কেরামকে শিক্ষা-দীক্ষার একক যিম্মাদার মনে করে নিজে কোনোরূপ দায়িত্বপালন বা সহযোগিতা থেকে বিরত থাকলে কিংবা নিজেকে সর্বেসর্বা দায়িত্বশীল মনে করে আসাতিযায়ে কেরামের পরিচর্যা ও তত্ত্বাবধানকে ক্ষতিগ্রস্ত করলে সন্তানের শিক্ষাজীবনে এর মারাত্মক বিরূপ প্রভাব পড়ে থাকে। কাজেই এসময়ে সন্তানের কল্যাণকামনায় স্বীয় দায়িত্বপালন ও আসাতিযায়ে কেরামের সহযোগিতায় আত্মনিয়োগ করা উচিত।

সন্তান মাদরাসায় থাকা অবস্থায় অভিভাবক যিম্মাদারী হিসেবে এই কাজগুলো করবেন-

১. আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে সবসময় কায়মনোবাক্যে দু'আ করবেন, যেন তিনি সন্তানের জন্য ইলমে দীন অর্জন সহজ করে দেন, সবধরনের বাধা-প্রতিবন্ধকতা দূর করে দেন এবং অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করেন।

২. সপ্তাহে অন্তত একবার সশরীরে মাদরাসায় উপস্থিত হয়ে সন্তানের কাছে তার পড়ালেখা ও আমল সম্পর্কে খোঁজখবর নিবেন। এসময় সন্তানকে পড়ালেখা ও আমলের উন্নতি এবং মানসিক শক্তি যোগানোর উদ্দেশ্যে প্রেরণাদায়ক কথা বলবেন। শুরুর দিকে এই উপস্থিতি সপ্তাহে একাধিকবার হওয়া উচিত। কেননা মাদরাসায় ভর্তি করার পর সবেমাত্র পরিবার ছেড়ে যাওয়ার কারণে উস্তাদের প্রতি সন্তানের টান তৈরি হতে সময়ের প্রয়োজন হয়। কাজেই উস্তাদের সঙ্গে সন্তানের গভীর সম্পর্ক হওয়ার আগ পর্যন্ত ঘরের মতোই অভিভাবক পড়ালেখা ও আমলের তদারকি করবেন, যেন সন্তান এ সময়টুকুও অভিভাবকহীন না থাকে। কারণ, অভিভাবকহীনকে শয়তান সহজেই বিপথগামী করতে পারে।

৩. শুরু থেকেই সন্তানের মনে উস্তাদের ভক্তি ও মহব্বত তৈরি করার চেষ্টা করবেন এবং নিজেকে পরিপূর্ণভাবে

উস্তাদের তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করার গুরুত্ব বোঝাবেন। কারণ, সময়ের ব্যবধানে সন্তান যখন বড় হতে থাকবে তখন স্বাভাবিকভাবেই ধীরে ধীরে পরিবার থেকে কিছুটা দূরত্ব তৈরি হবে। ফলে পরিবারের অভিভাবকত্ব আগের মতো শক্তিশালী থাকবে না। তাই বাস্তবতার দাবী হলো, সেই সময় আসার আগেই উস্তাদের প্রতি সন্তানের মহব্বত তৈরি করে দেয়া এবং তাকে উস্তাদের তত্ত্বাবধানে সমর্পিত হওয়ার গুরুত্ব এমনভাবে উপলব্ধি করানো, যেন সে নিজের জন্য জীবনভর কারো তত্ত্বাবধানে চলা জরুরী মনে করে।

৪. অভিভাবকের জন্য প্রতি মাসে অন্তত একবার সন্তানের আসাতিযায়ে কেরামের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত। কেননা অভিভাবকগণ সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার প্রধান দায়িত্বশীল হওয়া সত্ত্বেও এসময় প্রধানত আসাতিযায়ে কেরামই সন্তানের তত্ত্বাবধান করেন। অথচ ইতোপূর্বে জন্মের পর থেকে অভিভাবক তার শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্বপালন করে আসার কারণে তার শিক্ষা-দীক্ষা ও স্বভাবপ্রকৃতি সম্পর্কে তিনিই বেশি অবগত থাকেন। তাই আসাতিযায়ে কেরামের সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করার জন্য এবং সন্তানের সুষ্ঠু পরিচর্যার জন্য এসময় অভিভাবকের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন বোধ করেন। তাছাড়া সন্তানের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যত প্রত্যাশী অভিভাবকের অন্তত সন্তানের ভালোমন্দ জানার উদ্দেশ্যেও এই যোগাযোগের প্রয়োজন আছে। এজন্য অভিভাবকের কর্তব্য হলো, নিজ উদ্যোগে আসাতিযায়ে কেরামের সঙ্গে যোগাযোগ করে সন্তানের অবস্থাদির খোঁজ নেয়া এবং তাঁরা চাইলে পরামর্শ দেয়া। এ সময়ে সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে আসাতিযায়ে কেরামের প্রতি অভিভাবকের পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা জরুরী। অভিভাবক আসাতিযায়ে কেরামের প্রতি নিজের আস্থা ও মহব্বতের প্রকাশ করলে এতে তাঁদের মনে উক্ত সন্তানের প্রতি বিশেষ দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়।

৫. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও আইন-কানুনের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা পোষণ করতে হবে। কারণ, সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার সূচনায় চূড়ান্ত যাচাই-বাছাই করে অভিভাবক যখন কোনো প্রতিষ্ঠানকে সন্তানের ঠিকানা হিসেবে নির্বাচন করেন তখন অবধারিতভাবেই মাদরাসার ব্যবস্থাপনায় সন্তুষ্ট হয়েই সন্তানকে সেখানে ভর্তি করেন। কাজেই সন্তানকে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে অভিভাবক যেন প্রকারান্তরে অলিখিত অঙ্গীকার করেন যে, এই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ও আইন-কানুন আমার মনঃপূত হয়েছে এবং এই সবকিছুর সঙ্গে আমি একমত; সন্তানের মতো আমিও প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলবো। কাজেই এসময় অভিভাবকের কর্তব্য হলো, প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও সময়সূচীর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। আল্লাহ না করুন, সন্তানকে ভর্তি করার পর যদি প্রতিষ্ঠানের কোনো ব্যবস্থাপনা বা আইন-কানুন তার জন্য ক্ষতিকর মনে হয় তাহলে এ ব্যাপারে আদবের সঙ্গে আসাতিযায়ে কেরামের সঙ্গে আলোচনা করবেন। তাঁদের সঙ্গে ন্যূনতম রূঢ় আচরণ করা বা সন্তানকে এ সম্পর্কে সামান্য আঁচ পেতে দেয়া থেকে সতর্ক থাকবেন। অন্যথায় এ ব্যাপারে অভিভাবকের অন্যায় অবহেলার ফলে সন্তানের চরিত্র ও মানসিকতায় মারাত্মক বিরূপ প্রভাব পড়ে থাকে।

৬. প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সন্তানের কল্যাণার্থে কোনো প্রকার নির্দেশনা দেয়া হলে কিংবা পত্র বা ফোনে যোগাযোগ করা হলে অথবা প্রতিষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হলে তাতে অভিভাবক অবশ্যই সাড়া দিবেন। যেহেতু আসাতিযায়ে কেরাম এবং অভিভাবক- উভয়পক্ষই সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্বশীল, এজন্য পারস্পরিক পরামর্শ ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে সন্তানের উন্নতির লক্ষ্যে যৌথভাবে কাজ করতে হয়। কখনো প্রতিষ্ঠান অভিভাবকের পরামর্শ নেয়ার জন্য, আবার কখনো কোনো জরুরী নির্দেশনা দেয়ার জন্য অভিভাবকের সহযোগিতার প্রত্যাশী হয়। সন্তানের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যই এসব ক্ষেত্রে সাড়া দেয়া উচিত।

সন্তানের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ

আল্লাহ না করুন- যদি কখনো সন্তানের ব্যাপারে আসাতিযায়ে কেরাম বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পড়ালেখা কিংবা আমল-আখলাক সম্পর্কিত ত্রুটির অভিযোগ আসে তাহলে অভিভাবক উত্তেজিত বা বিচলিত না হয়ে তৎক্ষণাৎ আল্লাহমুখী হবেন। কাকুতি মিনতি সহকারে রোনাজারি করে আল্লাহ তা'আলার কাছে ইস্তেগফার করত সন্তানের কল্যাণের জন্য করুণা ও রহম চাইবেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে একনিষ্ঠ মনে সন্তানের সংশোধনের জন্য করণীয় চিন্তা করবেন। তৃতীয়ত আসাতিযায়ে কেরামের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা ও পরামর্শ করবেন। চতুর্থত একাকী সন্তানের কাছে বসে ধৈর্য সহকারে সম্পূর্ণ সমস্যা শুনে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও উপদেশ দিবেন। পঞ্চমত আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য চেয়ে পরিপূর্ণ বিচক্ষণতা ও দরদের সঙ্গে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করবেন। সর্বোপরি নিজে আল্লাহমুখী হওয়ার পাশাপাশি সন্তানকেও আল্লাহ তা'আলার কাছে যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পানাহ ও ক্ষমা চাওয়ার জন্য উৎসাহিত করবেন।

প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে সন্তানের অভিযোগ

শিক্ষাজীবন শুরুর প্রাক্কালে অভিভাবকের দায়িত্ব হলো, আসাতিযায়ে কেরাম ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি সন্তানের মনে মহব্বত ও আসক্তি তৈরি করা। অভিভাবক সফলতার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করার পরও সন্তানের মধ্যে মাদরাসা বা আসাতিযায়ে কেরামের প্রতি কাঙ্ক্ষিত আকর্ষণ ও মহব্বত পরিলক্ষিত না হলে, কিংবা সন্তানের কথায় প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে অভিযোগের আভাস পাওয়া গেলে অভিভাবক প্রথমত সন্তানকে নিয়ে একাকী বসে তার সম্পূর্ণ কথা বিস্তারিতভাবে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। দ্বিতীয়ত পিতামাতা ও আসাতিযায়ে কেরামের আনুগত্যের উপকারিতা ও অবাধ্যতার ক্ষতি, আসাতিযায়ে কেরাম ও মাদরাসার ব্যাপারে অভিযোগ-শেকায়াতের ক্ষতিসমূহ, আকাবিরের ছাত্রজীবন ও কুরবানী এবং ইলম ও উলামায়ে কেরামের মর্যাদা ইত্যাদি বিষয় তাকে বিস্তারিত বুঝিয়ে তার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আশ্বস্ত করবেন। তৃতীয়ত মাদরাসার আসাতিযায়ে কেরামের সামনে চূড়ান্ত আদব ও তা'যীম প্রকাশ করে এবং শব্দচয়নে সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে কথাগুলো পেশ করবেন এবং তাঁদের মতামত ও মন্তব্যগুলো পরিপূর্ণ মনোযোগ ও গুরুত্ব দিয়ে শুনবেন, সবশেষে সন্তানকে আসাতিযায়ে কেরামের পরামর্শ ও নির্দেশনা অনুযায়ী চালানোর ব্যাপারে তাঁদের সামনে দৃঢ় প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করে আসবেন। চতুর্থত আসাতিযায়ে কেরামের সঙ্গে কথা বলে সন্তানের ত্রুটি সাব্যস্ত হয়ে থাকলে তার সংশোধনের জন্য পূর্ববর্তী (সন্তানের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ)

শিরোনামে উল্লিখিত করণীয়গুলো অনুসরণ করবেন। আর আল্লাহ না করুন আসাতিযায়ে কেরামের ত্রুটি মনে হলে মাদরাসার আভ্যন্তরীণ দায়িত্বশীলদের সঙ্গে পূর্ণ আদব বজায় রেখে আলোচনা করবেন। খোদা-নাখাস্তা তারপরও সমাধান না হলে অবশ্যই কোনো দূরদর্শী আল্লাহওয়ালা আলেমে দীনের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর নির্দেশনা অনুসরণ করবেন।

এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা মনে রাখা উচিত যে, সামান্য ও সাধারণ কোনো সমস্যার কারণে সন্তানকে মাদরাসা থেকে উঠিয়ে নেয়া বা ঘন ঘন মাদরাসা পরিবর্তন করা সন্তানের পড়ালেখায় মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। তাই সতর্ক হওয়া উচিত, সন্তান যেন অভিভাবকের অন্যায় স্বেচ্ছাচারিতা ও অবিবেচনার শিকার না হয়।

আসাতিযায়ে কেরামের শাসন

সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার আজন্ম যিম্মাদার হিসেবে অভিভাবকের পরামর্শ আসাতিযায়ে কেরামের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি প্রতিষ্ঠানে সন্তানের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে তার ব্যাপারে আসাতিযায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনাও সমধিক তাৎপর্যপূর্ণ। বরং কোনোরূপ পার্থিব বিনিময় ও পারিশ্রমিক ব্যতীত যে দরাজদিল আসাতিযায়ে কেরাম লিল্লাহিয়্যাতের সঙ্গে হাজারো মাতা-পিতার বুকের মানিকদের যুগশ্রেষ্ঠ আলেমে দীন বানানোর সাধনায় লিপ্ত থাকেন তাঁদের সামান্য শাসন তালিবে ইলমের স্থায়ী সৌভাগ্যের মাধ্যম হতে পারে। কারণ, যাঁদের দিবারাত্রি চব্বিশ ঘণ্টার প্রতিটি নড়াচড়া ও হাঁটাচলা শতশত তালিবে ইলমকে বিশ্ববরেণ্য আলেমে দীন বানানোর ফিকিরে আচ্ছন্ন থাকে তাঁদের শাসন-বারণসহ প্রতিটি কাজ থেকেই নূরানিয়্যাতের ফল্গুধারা উৎসারিত হয়।

কাজেই কখনো সন্তান আসাতিযায়ে কেরামের আকস্মিক অসামান্য শাসনের শিকার হলে এতে বিমর্ষ না হয়ে বরং এটাকে সন্তানের জন্য কল্যাণকর ও তার সংশোধনের মাধ্যম মনে করা উচিত। এসময় সন্তানের প্রতি মায়া-মহব্বতের আতিশয্যে বিমর্ষতা আচ্ছন্ন করে ফেললেও সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে, আসাতিযায়ে কেরাম কিংবা সন্তান- কেউ যেন এই বিমর্ষতা ঘূর্ণাক্ষরেও অনুভব না করে। উপরন্তু আসাতিযায়ে কেরামের শাসন সমর্থন করে সন্তানকে তার ত্রুটির ব্যাপারে মনোযোগী করা এবং নির্জনে নিরালায় নসীহতপূর্ণ নরম কথা বলে ভবিষ্যতে এরকম ভুল না করার দৃঢ় প্রত্যয়ে প্রত্যয়ী করে তোলা উচিত। অন্যথায় সন্তান এ ব্যাপারে অভিভাবকের সামান্যতম অসন্তোষ বা বিমর্ষতার কথা বুঝতে পারলে সেটা তার সাফল্য ও অগ্রগামিতার জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হবে।

পলায়ন ও অনাসক্তি

কওমী মাদরাসার প্রাথমিক শ্রেণী পড়ুয়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তালিবে ইলমের অভিভাবককে এই সমস্যায় পড়তে হয় যে, অভিভাবক ও আসাতিযায়ে কেরামের ঐকান্তিক চেষ্টা-প্রয়াস সত্ত্বেও সন্তান মাদরাসায় যাওয়ার ব্যাপারে অনাগ্রহী থাকে। হয়তো ছুটির পরে বাড়ি থেকে মাদরাসায় যেতে অস্বীকৃতি জানায় কিংবা মাদরাসা খোলা থাকা অবস্থায় আসাতিযায়ে কেরাম বা অভিভাবকের অনুমতি ও অবগতি ছাড়াই মাদরাসা থেকে বাড়িতে বা অন্য কোথাও পালিয়ে যায়। এটা হয়তো প্রতিষ্ঠান বা অভিভাবকের কড়াকড়ির কারণে হয়, নতুবা শয়তানের ধোঁকা ও প্ররোচনায় পড়ে সন্তান পড়ালেখার ব্যাপারে নিরাসক্তি প্রকাশ করে। কাজেই আসাতিযায়ে কেরাম ও অভিভাবক- উভয়পক্ষের উচিত, তালিবে ইলম সন্তানের সঙ্গে বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার ভিত্তিতে নম্র আচরণ করা।

প্রথম প্রথম অনেক অভিভাবক এই সমস্যায় পড়ে খুব বিচলিত হয়ে পড়েন। কেউ না জেনে সন্তানকে দায়ী করে তাকে অনর্থক নাজেহাল করেন; আবার কেউ আসাতিযায়ে কেরামকে দায়ী করে অন্যায়ভাবে তাঁদেরকে বিরক্ত করেন। অথচ এতে শয়তান ঐ তালিবে ইলমকে আরো বেশি প্ররোচিত করার সুযোগ পেয়ে যায়। তাই অভিভাবক দায়িত্বশীলতার সঙ্গে পরিপূর্ণ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা বজায় রেখে এই প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করলে আশা করি সমস্যার সমাধান হবে, ইনশাআল্লাহ-

১. আল্লাহ তা'আলার কাছে রোনাজারী করে দু'আ করবেন, আল্লাহ তা'আলা যেন সন্তানের অন্তরে ইলম অর্জনের প্রবল আগ্রহ ও স্পৃহা সৃষ্টি করে দেন এবং তাকে যেন ইলমে দীন থেকে বঞ্চিত না করেন।

২. সন্তানের সঙ্গে একান্তভাবে আলাপ করে তার অভিযোগ-অনুযোগ শুনবেন। অতঃপর পিতামাতা ও আসাতিযায়ে কেরামের আনুগত্যের উপকারিতা ও অবাধ্যতার ক্ষতি, মাদরাসা খোলা অবস্থায় অনুপস্থিতি ও পলায়নের ক্ষতিসমূহ, আকাবিরের ছাত্রজীবন ও কুরবানী এবং ইলমে দীন ও উলামায়ে কেরামের মর্যাদা ইত্যাদি বুঝিয়ে তার সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিবেন।

৩. সন্তানের সঙ্গে কথা বলে স্বয়ং অভিভাবকের ত্রুটি ও অবহেলা সাব্যস্ত হলে আল্লাহ তা'আলার কাছে ইস্তেগফার করে সন্তানের হকগুলো আদায়ের ব্যাপারে আরো বেশি মনোযোগী হবেন। পক্ষান্তরে আসাতিযায়ে কেরামের অবহেলা মনে হলে তাদের সামনে চূড়ান্ত আদব ও শব্দচয়নে সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে কথাগুলো পেশ করবেন এবং সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে তাঁদের কথা শুনবেন, সবশেষে সন্তানকে আসাতিযায়ে কেরামের নির্দেশনা অনুযায়ী চালানোর ব্যাপারে অবশ্যই তাঁদের সামনে নিজের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে আসবেন।

৪. আসাতিযায়ে কেরামের আলোচনায় সন্তানের ত্রুটি সাব্যস্ত হলে তার সংশোধনের জন্য উপরে (সন্তানের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ অংশে) উল্লিখিত করণীয়গুলো অনুসরণ করবেন। আল্লাহ না করুন, যদি আসাতিযায়ে কেরামের ত্রুটি মনে হয় তাহলে মাদরাসার আভ্যন্তরীণ দায়িত্বশীলদের সঙ্গে পূর্ণ আদব বজায় রেখে এ বিষয়ে আলোচনা করে সমাধান করার চেষ্টা করবেন। সন্তানের জীবনগঠনের লক্ষ্যে তার সমস্যাগুলো সমাধানে আন্তরিক হলে আল্লাহ তা'আলা সহজ রাস্তা খুলে দিবেন, ইনশাআল্লাহ।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

লেখক: শিক্ষক, জামি'আ ইসলামিয়া চরওয়াশপুর মাদরাসা, হাজারীবাগ, ঢাকা।

বড়দের জীবন

বাংলাদেশে দাওয়াত ও তাবলীগের পিতৃপুরুষ, ঈমানী পুনঃজাগরণের পথিকৃৎ

মাওলানা আব্দুল আযীয খুলনাবী (বড় হুযূর রহ.)

মাওলানা শফীক সালমান

উদয়পুর। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার প্রসিদ্ধ একটি জনপদ। বৃহত্তর খুলনা বিভাগের বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট থানার ঐতিহাসিক এই গ্রাম যুগযুগ ধরে পীর আউলিয়াদের আবাসভূমি। এই উদয়পুরেই উদিত হয়েছিল বাংলার আকাশে দাওয়াত ও তাবলীগের সোনালী সূর্য। এখান থেকেই যাত্রা শুরু হয় মোবারক এই মেহনতের। সেই কাফেলার অগ্রপথিক ছিলেন মাওলানা আব্দুল আযীয রহ.। তিনি বড় হুযূর নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ইসলামী দাওয়াহ, তা'লীম-তাযকিয়া, রিয়াযত-মুজাহাদা, যিকির, বাই'আত ও বর্ণিল কর্মতৎপরতার প্রায় প্রতিটি অঙ্গনে তার প্রতিভাদীপ্ত সাহসী নেতৃত্বসুলভ দূরদর্শী অংশগ্রহণ ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবে। তিনি এ দেশের ঈমানী আন্দোলনের আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। আমরা তার কর্মময় জীবনের বিশেষ কিছু দিক পাঠকের সামনে তুলে ধরছি।

জন্ম ও শৈশব

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে খুলনা জেলার তেরখাদা থানাধীন বামনডাঙ্গা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শেখ মুসাহেবুদ্দীন। নিজ গ্রামে মুনশী গুল মুহাম্মাদ রহ. এর কাছে তার লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয়। এরপর নড়াইলের হাজীগ্রামে মাওলানা হাতেম সাহেবের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। এরপর কোলকাতার আখড়া আলিয়া মাদরাসা থেকে আলিম ও বটতলা আলিয়া থেকে ফাযিল, সবশেষে কোলকাতা আলিয়া থেকে কামিল পাশ করে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে আসেন।

গৌরবময় কর্মজীবন

দেশে ফিরে এলাকার মুরুব্বীদেরকে একত্রিত করে বললেন, আমি চাই নিজ এলাকার ছেলে-মেয়েরা আমার ইলম থেকে উপকৃত হোক। পরামর্শ করে বিনা বেতনে কাচারীঘরে মকতব পড়ানো শুরু করেন। এভাবে তিন বছর চলতে থাকে। একদিন উদয়পুরের বিখ্যাত বুযুর্গ পীরে কামেল মাওলানা আব্দুল হালীম রহ. বামনডাঙ্গা সফরে আসেন। লোকমুখে মাওলানা আব্দুল আযীয সাহেবের উচ্চপ্রসংশা শুনে এবং বাচ্চাদের পাঠদান স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে তাকে উদয়পুর মাদরাসায় নিয়ে যান।

বৈবাহিক জীবনযাত্রা

এক বছর পর পীর সাহেব নিজের কন্যাকে তার সঙ্গে বিবাহ দেন। প্রথম সন্তান জন্মদানের সময় স্ত্রী ইনতিকাল করেন। কিন্তু জামাতা হিসেবে পীর সাহেবের স্নেহছায়ায় থাকতে থাকেন।

সৌভাগ্যের হাতছানি

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (ছদর সাহেব) রহ. একবার দিল্লীতে হযরতজী ইলয়াস রহ. এর সঙ্গে সাক্ষাত করতে যান। হযরতজী রহ. ছদর সাহেব রহ.কে বাংলাদেশেও দাওয়াতের মেহনত চালু করে দিতে বলেন। 'মরদুম শেনাসী' তথা প্রতিভাবান, চৌকষ ও যথাযোগ্য কর্মী নির্বাচন করতে পারা ছিল হযরত ছদর সাহেব রহ. এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যার মধ্যে তিনি যে কাজের প্রতিভা লক্ষ্য করতেন তাকে সে কাজে লাগিয়ে দিতেন। তিনি বাংলাদেশে দাওয়াতের কাজ চালু করার জন্য নিবেদিতপ্রাণ একজন মুখলিস লোক খুঁজছিলেন। একদিন ছদর সাহেব রহ. গওহরডাঙ্গার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল উদয়পুরে সেখানকার বিখ্যাত পীর আব্দুল হালীম সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করতে যান। তিনি সেখানে মাওলানা আব্দুল আযীয সাহেবকে দেখতে পান। তার বাহ্যিক সৌন্দর্য ছিল ফেরেশতা সূরত, আর অভ্যন্তরও ছিল পবিত্র, নিষ্কলুষ । বাংলাদেশে তাবলীগের এই মহান কাজের জন্য ছদর সাহেব রহ. তাকেই নির্বাচন করেন এবং পীর সাহেবের অনুমতি নিয়ে তাকে কোলকাতা পাঠিয়ে দেন। পরে সেখানকার এক মসজিদে খিদমত ঠিক করে দেন এবং মাওলানা আরশাদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে চলতে বলেন এবং হালাত জানাতে বলেন। বড় হুযূর নিজেই বলেছেন, 'আমি সেখানে জুমু'আর নামায পড়াই; মসজিদ ভরে যায়। কিন্তু আসরে এক কাতার লোকও হয় না। একদিন মাওলানা আরশাদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে গাশতে বের হলাম; মাগরিবে পুরো মসজিদ ভরে গেল।' এরপর থেকে তিনি তাবলীগের কাজে আন্তরিক হন। অতঃপর এই কাজ ভালো করে রপ্ত করার জন্য ছদর সাহেব রহ. তাকে নিযামুদ্দীনে হযরতজী ইউসুফ রহ. এর সান্নিধ্যে যেতে বলেন। (এ বছরই হযরতজী ইলয়াস রহ. ইনতিকাল করেন।) দিল্লী থেকে একটি জামাআত কোলকাতায় এসেছিল। তিনি তাদের সঙ্গে নিযামুদ্দীন চলে যান। সেখানে দীর্ঘ সময় ব্যয় করে তাবলীগের কাজ শেখেন।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

দেশে ফেরার সময় তিনি সাথে করে একটি জামাআত নিয়ে আসেন। বড় হুযূরের শ্বশুর পীর সাহেব তখন বয়োবৃদ্ধ; অতিশয় দুর্বল। জামাআতের আমল ও নেযাম দেখে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং দু'জনের কাঁধে ভর করে তিনিও গাশতে বের হন। এরপর তিনি নিজ জামাতাকে মাদরাসা হতে অব্যাহতি দিয়ে তাবলীগের কাজে নিয়োজিত করেন। পীর সাহেব ও ছদর সাহেব রহ. পরামর্শক্রমে বড় হুযূর রহ. কে এই কাজের আমীর নিযুক্ত করেন। সেই থেকে আজীবন তিনি বাংলাদেশের আমীরুল মুবাল্লিগীন ছিলেন।

তাবলীগী কেন্দ্রীয় মারকায

প্রথম মারকায : উদয়পুর মাদরাসার মসজিদকে তাবলীগের মারকায নির্ধারণ করে সর্বপ্রথম কাজ শুরু হয়।

দ্বিতীয় মারকায : একসঙ্গে মাদরাসা ও দাওয়াতের কাজে কিছুটা অসুবিধা দেখা দেয়ায় ছদর সাহেব রহ. এর পরামর্শে বড় হুযূরের গ্রামের বাড়িতে মারকায স্থানান্তরিত হয়।

তৃতীয় মারকায : একবার ইজতিমায় গিয়ে ছদর সাহেব রহ. বললেন, গ্রাম এলাকা মারকাযের জন্য উপযুক্ত নয়; খুলনা শহরে নিয়ে যাও। তারপর মুসলমানপাড়ার তালাবওয়ালী মসজিদ হয় তাবলীগের তৃতীয় মারকায। বড় হুযূর এই মারকায সংলগ্ন একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যা আজ দক্ষিণবঙ্গের সবচেয়ে বড় দীনী প্রতিষ্ঠান;

ঐতিহ্যবাহী জামি'আ ইসলামিয়া আরাবিয়া দারুল উলূম খুলনা।

চতুর্থ মারকায : এখানে একবার ইজতিমার পর পরামর্শ হলে ছদর সাহেব রহ. বললেন, বাবা আব্দুল আযীয! দেহ একস্থানে আর রূহ অন্যস্থানে। এভাবে তো কাজে বরকত হচ্ছে না। তুমি বরং মারকায লালবাগ শাহী মসজিদে নিয়ে এসো। (তখন ছদর সাহেব রহ. লালবাগ জামি'আ কুরআনিয়ার মুহতামিম ছিলেন।)

পঞ্চম মারকায : একসময় লালবাগ শাহী মসজিদে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ইজতিমার সুবিধার্থে কেল্লার উত্তর-পশ্চিম দিকে মাঠ সংলগ্ন খান মুহাম্মাদ মসজিদকে মারকায করা হয়।

ষষ্ঠ মারকায : কিছুদিন পর এখানেও জায়গা হচ্ছিল না। ছদর সাহেব রহ. শহরের ভেতরে বড় মাঠ সংলগ্ন কোন মসজিদ দেখতে বললেন। তখন রমনা পার্ক সংলগ্ন মোঘল আমলে তৈরি মালওয়ালী মসজিদের সন্ধান মিলল; কিন্তু আয়তনে খুব ছোট। ছদর সাহেব রহ. বললেন, প্রয়োজনে পার্কের জায়গা বরাদ্দ নিয়ে মসজিদ বড় করা যাবে। এটাই মারকায হোক। ছয় উসূলের মেহনতের সেই ষষ্ঠ মারকাযই আজকের ঐতিহাসিক কাকরাইল মসজিদ। এসব মারকাযে তখন মুকীম হিসেবে কেউ থাকতেন না; সবাই আসা-যাওয়া করে কাজ করতেন। একমাত্র বড় হুযূর রহ. সব মারকাযেই একা পড়ে থাকতেন। কাকরাইলের শুরুর দিকেও ছোট টিনের ছাপড়া ছিল। পানির ব্যবস্থা ছিল না। সেখানেও তিনি একা থাকতেন। অবশ্য পরবর্তীতে আরো অনেকে যোগ দেন।

আত্মশুদ্ধি ও বাইআত

হযরতজী ইলয়াস রহ., ইউসুফ রহ. ও ইন'আমুল হাসান রহ. যেমন সর্বদা কোন শাইখে তরীকতের হাতে বাইআত এবং খিলাফতপ্রাপ্ত ছিলেন, তদ্রূপ মাওলানা আব্দুল আযীয রহ.ও শুরুতে উদয়পুরের পীর সাহেবের হাতে, তার ইনতিকালের পর হযরতজী ইউসুফ রহ. এর হাতে, তার ইনতিকালের পর শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. এর হাতে বাইআত ছিলেন। প্রতি রমাযানে শাইখের খানকায় ই'তিকাফ করতেন। তিনি শাইখ যাকারিয়া রহ. এর খিলাফত লাভে ধন্য হয়েছিলেন। সারাদেশে তার অসংখ্য মুরীদ রয়েছে। তিনি ছিলেন উদারমনা। দাওয়াতের সঙ্গে আত্মশুদ্ধির অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন; যা আজ বাংলাদেশের পরিবেশে বিরল।

আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য

বিশেষ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে বাইআত হওয়া ছাড়াও তিনি হক্কানী পীর মাশাইখদের সান্নিধ্য অর্জন করেছেন এবং তাদের যথাযথ কদর করতেন।

হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. কখনো আসলে বড় হুযূর নিজের গায়ের গামছা দিয়ে হাফেজ্জী হুযূরের জুতা সুন্দর করে পেঁচিয়ে নিজের কাছে রাখতেন। যাওয়ার সময় বের করে নিজে হাফেজ্জী হুযূরের সামনে দিতেন।

একবার করাচীর হযরত হাকীম আখতার রহ. খুলনা সফরে এসে সুন্দরবন দেখার প্রোগ্রাম করলেন। বড় হুযূরও করাচীর হযরতের কাছে সফরসঙ্গী হওয়ার অনুমতি চাইলেন। এ সফরে তিনি হাকীম আখতার রহ. এর সামনে কোন কথাই বলেননি; বরং ধ্যানের সাথে বয়ান শুনতেন।

আলেমদেরকে শ্রদ্ধা নিবেদন

বড় হুযূরের ছেলেরা মাদানীনগরে সন্দ্বীপের পীর সাহেবের কাছে পড়ত। মাঝেমধ্যে নিজে যেতেন পীর সাহেবের মাদরাসায়। শেষদিকে কাউকে চিনতে না পারলেও সন্দ্বীপের পীর সাহেবকে চিনতেন। পীর সাহেব যদি কখনো আসতেন তিনি অসুস্থ অবস্থায়ও বলতেন, আমাকে উঠাও, আমাকে উঠাও, আমার উস্তাদ আসছেন, তিনি আমার ছেলেদেরকে পড়ান। এই উত্তম চরিত্রমাধুর্য ও বিনয়ের মাধ্যমে তিনি উলামায়ে কেরামের সামনে দাওয়াতী কাজকে পেশ করেছেন। যার ফলে বাংলার হক্কানী উলামা সমাজ এই কাজকে আপন করে নিয়েছেন। একজন খাঁটি মুবাল্লিগের উজ্জ্বল নমুনা ছিলেন তিনি।

জামি'আ রাহমানিয়ার প্রতি নেকনযর

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. বলেন, আমার দীর্ঘ দিনের ইচ্ছা ছিল মাদরাসার পক্ষ হতে একজন উস্তাদকে সালে পাঠানোর। রাহমানিয়ায় এসে আমরা তা বাস্তবায়ন করতে পেরেছি। এই তারতীব ঠিক করে পরামর্শ ও দু'আর জন্য আমি কাকরাইলে বড় হুযূর রহ. এর কাছে পেশ করলে তিনি খুব খুশি হন, দু'আ দেন, সাহস যোগান এবং বলেন, আমার জানামতে বর্তমানে বাংলাদেশে আর কোন মাদরাসায় এ ধরনের নেযাম নেই। এখন থেকে সব জায়গায় আমি রাহমানিয়ার এই নিযাম পেশ করব। বড় হুযূরের সেই নেক নযরের ফলে ইতিমধ্যে রাহমানিয়া হতে প্রায় ১৫/১৬ জন উস্তাদ তাবলীগী কাজে সাল লাগিয়েছেন।

আমর বিল মা'রূফের আমলী দাওয়াত

তিনি যাকে যেখানে পেতেন দাওয়াত দিতেন। তিনি বয়ানে কথা বলতেন খুব কম। দু-চার কথা বলে শুধু অঝোর ধারায় কাঁদতেন। সেই সাদামাটা কথা মানুষের অন্তরে প্রভাব ফেলত। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে দাওয়াত নিয়ে গেছেন। যশোর এয়ারপোর্টে জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর গোলাম আযমকে দাওয়াত দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদকে দাওয়াত দিয়েছেন। তার কাছে কেউ দু'আ নিতে আসলে সে যে-ই হোক না কেন, তিনি শর্ত জুড়ে দিতেন— দাওয়াতের কাজে সময় লাগাতে হবে।

নাহি আনিল মুনকার

তার সামনে শরীয়ত-বিরোধী কোন কাজ হলে তিনি তার প্রতিবাদ করতেন। একবার তিনি গোয়ালন্দ ফেরিঘাট পার হওয়ার সময় দেখলেন লঞ্চে এক অন্ধ ব্যক্তি পয়সা উঠানোর জন্য দোতারা বাজিয়ে গানের আসর জমিয়েছে। তিনি ভীড় ঠেলে সামনে গিয়ে অন্ধের হাত থেকে দোতারাটি কেড়ে নিয়ে ফেলে দিলেন। চেহারায় এত প্রভাব ছিল যে, কেউ কিছু বলার সাহস করেনি। ক্ষেত্রবিশেষে কাউকে শাসন করতে গিয়ে চপেটাঘাতও করতেন।

মা'মূলাত

তিনি সুন্নাতের পূর্ণ পাবন্দ ছিলেন। নাওয়াফেলের খুব ইহতিমাম করতেন। সফরেও তাহাজ্জুদ, ইশরাক, আওয়াবীন, চাশত ইত্যাদি ছাড়তেন না। নিয়মিত যোহরের পূর্বে সালাতুত তাসবীহ আদায় করতেন। সপ্তাহে দু'দিন সোমবার ও বৃহস্পতিবার এবং প্রতি মাসে তিনদিন ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ (আইয়ামে বীয) রোযা রাখতেন। এমনকি হজ্জের সফরেও ছাড়তেন না। জীবনে প্রায় ৪০ বার হজ্জ করেছেন। চলন্ত ট্রেনে দাঁড়িয়েও ইশরাক, আওয়াবীন পড়তেন। সকাল-সন্ধ্যার তাসবীহাত নিয়মিত আদায় করতেন। সফরে পুরো সময় কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

একবার হিন্দুস্তান সফরে হযরত অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডাও পড়েছিল। এর মাঝে তিনি নফল রোযা রাখতে চাইলেন। সাথীরা নিষেধ করলে হুযূর রাগ হয়ে বললেন, শেষরাতে এক গ্লাস পানি দিতেও কি আপনাদের কষ্ট হবে!

ঠিক আছে, আমিই ব্যবস্থা করে নিব। আল্লাহ তা'আলাই সাহরীর ব্যবস্থা করে দিবেন। আমাকে বাধা দিবেন কেন? সাথীরা ভাবলেন, ঠিক আছে! আমরা না হয় উঠে একটু পানি গরম করে দিলাম। শেষরাতে এক সাথী উঠে দেখে বড় হুযূর রহ. এর মাথার কাছে শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. এর আরেকজন খলীফা মাওলানা ইউসুফ মাতালা সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। এত বড় বুযুর্গকে দেখে সবাই দিশেহারা। তিনি বললেন, আমাদের জানা আছে যে, আব্দুল আযীয সাহেব ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে রোযা রাখেন। তাই আমার মেয়েরা রাত জেগে তার জন্য সাহরীর ব্যবস্থা করেছে। প্রায় ২২/২৩ রকমের গরম খাবার সামনে হাযির। (সুবহানাল্লাহ)

দু'আ ও রোনাযারী

যে কোন পেরেশানী সামনে আসলে তিনি সালাতুল হাজত পড়ে খুব কান্নাকাটি করতেন এবং কুদরতীভাবে সব ফয়সালা করিয়ে নিতেন। শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. বলতেন, আল্লাহর দরবারে ক্রন্দনকারীকে দেখতে হলে মাওলানা আব্দুল আযীযকে দেখ।

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে সিঙ্গাপুর সফরে গিয়ে টাকা-পয়সা, পাসপোর্ট সব হারিয়ে যায়। কিভাবে দেশে ফিরবেন সেজন্য দু'আ করতে ছিলেন। এর মধ্যে ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর ঘাতকেরা একটি বিমানে করে সিঙ্গাপুর পালিয়ে যায়। তাদেরকে নামিয়ে দিয়ে পাইলট বাঙ্গালী কাউকে খুঁজছিল যে, পেলে বিনা ভাড়ায় দেশে নিয়ে যাবে। কারণ বিমান তো ফাঁকাই যাবে। তখন একলোক তাকে বড় হুযূরের সন্ধান দিল। এভাবে তিনি সাথীদের নিয়ে বিনা ভাড়ায় বাংলাদেশে চলে আসলেন।

বড় হুযূর রহ. একবার আমেরিকা সফরকালে সংবাদ পৌঁছল, তার একমাত্র মেয়ে ইনতিকাল করেছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে দুই রাকাআত নামায পড়লেন। পরে দু'আর মধ্যে খুব কাঁদলেন। দু'আ শেষেই তিনি স্বাভাবিক হয়ে পূর্বের ন্যায় দাওয়াতী আমল চালাতে লাগলেন। কারো বোঝার উপায় ছিল না যে, এত বড় শোকাবহ ঘটনা ঘটেছে।

তার সামনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উচ্চারিত হলেই রাসূলের দীনী কুরবানীর কথা স্মরণ হয়ে চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ত। একেই বলে আশেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

বড়দের আস্থাভাজন

একবার দিল্লীতে আলোচনা উঠেছিল যে, কাকরাইলে শূরা গঠন করার দরকার। তখন হযরতজী ইউসুফ রহ. বলেছিলেন, মাওলানা আব্দুল আযীয যতদিন হায়াতে থাকবেন ততদিন তিনি আমীর থাকবেন। হযরত শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. বলেছিলেন, আব্দুল আযীয কি মারা গেছেন? মুরুব্বীদের এই নেক নযরের ফলে তিনি আমৃত্যু আমীর ছিলেন। ইনতিকালের পূর্বমুহূর্তে যখন বেশি মা'যূর হয়ে গিয়েছিলেন তখন শূরা গঠন করা হয়।

মুজাহাদা

বড় হুযূরের গোটা জীবনই ছিল মুজাহাদার যিন্দেগী। তিনি জীবিকা নির্বাহের জন্য দুনিয়াবী কোন মাশগালা গ্রহণ করেননি। তিনি কোলকাতা থেকে দিল্লী যাতায়াত করতেন ট্রেনে। আসন না পেলে সারাপথ দাঁড়িয়ে যেতেন। শুরুর দিকে ঢাকার চকবাজারে এক জামাআত নিয়ে এসেছিলেন। তাদেরকে মসজিদে ঢুকতে দেয়া হয়নি। সিঁড়িতে অবস্থান করে মেহনত করেছিলেন। সে সময়ের হযরতের ঘনিষ্ঠ এক সহচর কারী উমর আলী সাহেব বলেছেন, বড় হুযূর প্রায়ই গাছের পাতা খেতেন। পায়খানা হত বকরীর লেদার মত। পকেটে অর্থকড়ি থাকত না। মেহমানদারীর তো প্রশ্নই আসে না। তারপরও তিনি মেহনত করে গেছেন; যার ফল ভোগ করছে বর্তমান যুগের মানুষ।

হুযূর তাঁর ছেলেদেরকে বলেছিলেন, দুনিয়ার ফিকির কোনদিনও করিনি। তারপরও আল্লাহ তা'আলা যা দিয়েছেন, তোমরা সবাই মিলেও সারা জীবনে তা কামাতে পারবে না।

তাঁর কাছে অনেক হাদিয়া আসত। তিনি কিছুই জমা করেননি। দাওয়াতের কাজে খরচ করেছেন। জায়গা কিনে মাদরাসা, মসজিদ, মারকায বানিয়েছেন। খুলনা মারকাযের জায়গা হুযূরের নিজস্ব সম্পত্তি। খুলনা দারুল উলূম মাদরাসা হুযূরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেছে। দাওরায়ে হাদীস খোলা হলে প্রথম সবক তিনি নিয়েছেন। দারুল ইফতা খোলা হলে তিনি দু'আর মাধ্যমে উদ্বোধনকালে বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা এটাকে কবুল করেছেন।

এত অর্থকড়ি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতেন অথচ খুলনা মারকায সংলগ্ন নিজের ঘর ছিল টিনের ছাউনী আর মুলিবাঁশের বেড়ার তৈরি। ইজতিমার সময় এখানে মহিলাদের বসার ব্যবস্থা করা হত। হযরতজী ইউসুফ রহ. একবার ইজতিমায় বয়ান করতে এসে সেই ঘর দেখে বলেছিলেন, এ যেন হযরত মূসা আ. এর স্মারক। হযরতজীর মুখনিঃসৃত এই কথার করণে বড় হুযূর জীবদ্দশায় আর কোনদিন ঘর পাকা করেননি।

অদ্ভুত মেহমানদারী

তিনি খুব মেহমানদারী করতেন। কেউ আসলেই আগে বলতেন দস্তরখান বিছাও। হুযূরের কাছে সবসময় মদীনার খেজুর আর যমযমের পানি থাকত। হুযূর নফল রোযা রাখতেন। ইফতারের সময় উপস্থিত সবাইকে ইফতার করাতেন। কেউ রোযা রাখিনি বললে বলতেন, রোযা না রেখে এক ভুল করেছেন, আবার এখন ইফতার না করে আরেক ভুল করবেন! বসেন।

কোন সময় যদি পরিবেশনের কিছু না-ও থাকত তবুও বলতেন, দস্তরখান বিছাও। খাদেম বলত, হুযূর কিছুই তো নেই। হুযূর বলতেন, আরে ভাই! বিছাও। ইফতারের ২/১ মিনিট বাকী থাকতেও কোন ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু আযানের এক মিনিট/আধা মিনিট আগে কোথা থেকে এত ইফতারী এসে হাযির হত যে, সবার রাতের খানাও হয়ে যেত। খাযানায়ে গায়েবের উপর এমনই মজবুত ইয়াকীন ছিল তার।

অমূল্য মালফূযাত

বড় হুযূর বলতেন, তিনদিন সময় দিয়ে কেউ কুরআনের হাফেয হতে পারে না। মেট্রিক পাশ করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় তিনদিন সময় দিয়ে যা পাওয়া যায় তার মূল্য দুনিয়া সাতবার বিক্রি করলেও শোধ হবে না।

এক ব্যক্তি হুযূরের কাছে দু'আ চাইলে তিনি বলেন, বেটা! দু'আ করা লাগবে না; আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে যাও। দাওয়াতের কাজ করতে থাকো, তাহলে দু'আ তোমার পেছন পেছন ছুটবে।

আরো বলতেন, দীনের মেহনত হল দেহ আর আমল হল রূহ।

তিনি প্রায়ই বলতেন, আমরা দীনের মেহনত করতে করতে মরব এবং মরতে মরতে করব।

বিদেশ সফর

দাওয়াতের কাজকে মুখ্য বানিয়ে তিনি প্রায় প্রতি বছরই হজ্জে যেতেন। এছাড়াও আমেরিকা, ফ্রান্স, চীন, তুরস্ক, সিঙ্গাপুর, ভারত, পাকিস্তান, সিরিয়া, মিশর, আরব আমিরাত, রাশিয়া, সাউথ

আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন, জার্মানী, জাপান, কানাডা-সহ ইসলামী বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই সফর করেছেন।

সফরের টুকরো স্মৃতি

পূর্বে সিঙ্গাপুর সফরের আলোচনা করা হয়েছে। তিনিই সর্বপ্রথম প্যারিসে জামাআত নিয়ে যান। বিমানবন্দরে নামতেই মহিলাদের অভ্যর্থনা– কী সহযোগিতা করতে পারি? হুযূর মাথা নিচু করে রাখলেন। সাথীরা বলল, পথ ছেড়ে দাও, কোন সহযোগিতা লাগবে না। তারপর নিজেরাই গিয়ে হোটেলে উঠলেন। সেখানকার হালতও বড় করুণ। স্টাফ সবাই প্রায় নগ্ন মহিলা। রাতের বেলা মহিলা ছাড়া অবস্থান যেন মহাপাপ। একটু পর পর দরজায় মহিলারা কড়া নাড়ে। মহাঝামেলা। অবশেষে সাথীদের সঙ্গে পরামর্শ করে মহিলাদের কয়েক জোড়া জুতা কিনে দরজার সামনে রেখে দিলেন। এরপর ফ্রান্সের এক প্রান্তে কিছু নামেমাত্র মুসলমানদের সন্ধান পেলেন। দ্রুত সেখানে চলে গেলেন। তারা শুনেছে যে, তাদের পূর্ব পুরুষ মুসলমান ছিল। নামায, রোযা বলতে কিছুই বোঝে না। তাদেরকে তা'লীম-তরবিয়াত করে কয়েকজনকে বিশ্ব ইজতিমায় নিয়ে আসেন।

তুরস্ক সফরে তিনি ইস্তাম্বুলে অবস্থিত হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী রাযি. এর কবর যিয়ারত করেন।

চীনে যখন মজসিদ-মাদরাসা সম্পূর্ণ নিষেধ ছিল তখন তিনি দু'বার চীন সফর করেছেন। তাদেরকে শুধু ঘরের ভিতরে আযান-ইকামত ছাড়া নামায পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। বড় হুযূর বাইরের বেলকনিতে হাঁটাচলা করতেন। বাচ্চারা এসে তাকে জড়িয়ে ধরত। তিনি ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। গ্রাম থেকে লোকেরা তাকে দেখতে আসতো। তিনি শুধু মায়াবী নযরে তাকাতেন। গোয়েন্দারা পিছু নিয়েছিল তাই কিছু বলতেন না। কিন্তু আজ সেই পদধূলি, স্নেহের পরশ ও মায়াবী দৃষ্টির বরকতে চীনে হিদায়াতের সুবাতাস বইছে।

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে বাংলাদেশ থেকে সব বেসরকারি পাকিস্তানীদেরকে দেশে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছিল। হাজার হাজার মানুষের ভীড়। প্লেনে সিট নেই। হুযূর তখন দাওয়াতের কাজে পাকিস্তানে যাবেন। পাসপোর্ট জমা দিয়েছেনে। কিন্তু সিট হচ্ছে না। তিনি প্রত্যেক বার সালাতুল হাজত পড়েন আর জানতে চান সিটের ব্যবস্থা হয়েছে কিনা? উত্তর আসে, কোন সম্ভাবনা নেই। বাঙ্গালীদেরকে সিট দিবে না। হুযূর নামায পড়তে লাগলেন আর জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। এভাবে ছয়বার করার পর জানতে পারলেন, সিটের ব্যবস্থা হয়েছে। একেই বলে ইস্তিকামাত। এটাই হল ইয়াকীন। এদিকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তিনি আটকা পড়েন। প্রায় এক বছর পর দেশে ফিরে আসেন। এমন পরিস্থিতি হতে পারে তিনি আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু হালাতের কারণে তিনি দীনী কাজ বন্ধ রাখেননি।

এছাড়াও তিনি চার মাযহাবের ইমামগণের কবর যিয়ারত করেছেন।

কানাডায় সফরকালে বড় হুযূর রহ. লম্বা সফরের মাঝে গাড়ি থেকে নেমে কোন কারণ ছাড়াই ফাঁকা জায়গায় বসে উযূ করেছেন। পরবর্তীতে দেখা গেছে ঐসব স্থানে মসজিদ হয়ে গেছে, মুসাফিরখানা হয়েছে।

আমেরিকাতেও রাস্তার পাশে এমন অনেক মসজিদ হয়েছে।

সাউথ আফ্রিকার সফরে এক পেট্রোল পাম্পে থামলে বড় হুযূরকে দেখে এক মহিলা দৌড়ে এসে বলল, আমি মুসলমান হব। আমি যার অপেক্ষায় ছিলাম ইনিই সেই লোক হবেন।

বড় হুযূরের নিয়মিত মা'মূল ছিল রমাযানে মদীনায় হযরত যাকারিয়া রহ. এর খানকায় ই'তিকাফ করা। একবার রমাযানের আগে ইংল্যান্ড সফরে ছিলেন। সেখানে তখন বাংলাদেশের একজন পীর সাহেবও অবস্থান করছিলেন। তিনি তাবলীগের বিরুদ্ধে বলতেন। ফলে মুসলমানদের মাঝে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিল। সে বছর তিনি সাথীদের অনুরোধে মদীনার ই'তিকাফ বাদ দিয়ে পুরা রমাযান ইংল্যান্ডে অবস্থান করেন। যার ফলে ঐ পীর সাহেবের প্রভাব খর্ব হয়ে যায়।

পারিবারিক জীবন

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ৩টি বিবাহ করেছিলেন। প্রথম স্ত্রীর ইনতিকাল হয়ে গেলে ফরিদপুরের ভাঙ্গা থানার শাহ সাহেবের কন্যাকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয় স্ত্রীও নিঃসন্তান ইনতিকাল করেন। এর প্রায় পাঁচ বছর পর শরীয়তপুরে তৃতীয় বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে ৮ ছেলে ও ১ মেয়ে জন্মলাভ করে। ছেলেরা সবাই আলেম হয়েছেন। বড় ছেলে আমেরিকার ফ্লোরিডায় মেজো ছেলে খুলনা মারকাযে, তৃতীয় ছেলে আমেরিকা, চতুর্থ ছেলে ইংল্যান্ডে, পঞ্চম ছেলে কাতারে, ষষ্ঠ ছেলে দেশে, সপ্তম ছেলে আমেরিকার ক্লিভল্যান্ডে, অষ্টম ছেলে সুইডেনে থাকেন। সকলেই দীনী খিদমতের পাশাপাশি দাওয়াতের কাজের সাথে লেগে আছেন।

ইনতিকাল

এক বর্ণনা মতে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে টঙ্গী মাঠে জোড় চলাকালীন তিনি অছিয়ত করেছিলেন যে, আমাকে টঙ্গী মাঠের পাশে দাফন করবে। ২৩ অক্টোবর ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে তিনি ইনতিকাল করেন। বাদ জুমু'আ জানাযা হয়। টঙ্গী মাঠের কবরস্থানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দাফন করা হয়। হযরতের তৃতীয় পুত্র মাওলানা আব্দুর রহীম মাসরুর জানাযার ইমামতি করেন।

কর্মকৌশল ও লিল্লাহিয়্যাতের বিচারে তিনি অমর হয়ে থাকবেন। বড় হুযূর রহ. এর ন্যায় একজন উদারমনা ও সর্বমহলে মান্যবর অভিভাবকের আজ বড়ই অভাব। আল্লাহ তা'আলা তার যিন্দেগীর সকল কুরবানী কবুল করুন। তাকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম দান করুন। আমাদেরকেও তার আদর্শ হতে পাথেয় গ্রহণ করে দীনের কাজে জুড়ে থাকার তাওফীক দিন। আমীন।

লেখক : শিক্ষক, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

হিজাযের মুসাফির

মুফতী সাঈদ আহমাদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ছয়.

জরুরত পরিমাণ বিশুদ্ধ ইলমে দীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরযে আইন। দুঃখের বিষয় আজকের চিত্র সম্পূর্ণ উল্টো। মনে হয় অতি আবশ্যক ও বিশুদ্ধ ইলমে দীন শিক্ষা না করাই যেন প্রায় সকলের জন্য ফরযে আইন। আমাদের মনোভাব হল, শিখতে হবে জাগতিক শিক্ষা আর ধর্মীয় শিক্ষা হলে বিলকুল অশুদ্ধ কিংবা একেবারেই অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা। আমাদের যাপিত জীবনে সহীহ দীনী শিক্ষা এতটাই লা-ওয়ারিশ যে, যে কেউ চাইলে তাকে দাফন করে দিতে পারে। মূর্খতার উপর এতোটা দম্ভ ও অহমিকা মনে হয় ইতোপূর্বে কখনো পরিলক্ষিত হয়নি। নিত্য ইবাদত নামাযের অবস্থাই দেখুন! কত রকম নামাযী আর কত্তো রকমের নামায! ভাগ্য ভালো, এখনো এক জামাআতে একজনই ইমামতি করে। কিন্তু শত মুক্তাদী অন্তত নব্বই রকম নামায পড়ে। এদের প্রত্যেকেই মনে করে, সে ইমামের চেয়ে বেশি বোঝে কিংবা ইমামের কাছে তার শেখার মত কিছুই নেই। আছে শুধু শেখাবার জ্ঞান। হে ইমাম সাহেব! এভাবে চলবেন, অমুকটা বলবেন, এত মিনিট আগে আসবেন, পাগড়ী বাঁধবেন, জুব্বা পরবেন– কেবল এ জাতীয় নসীহত আর নসীহত! বেচারা ইমাম সাহেব ভেবেই পায় না যে, সে আসলে ইমাম নাকি মুক্তাদী? সম্পূর্ণ কুরআন-সুন্নাহ নির্ভর নামাযেই যখন বেচারা আলেমের এই দুর্গতি তাহলে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ-শাদী, সামাজিক রীতি-নীতি ও রাজনীতিতে তার যে কী দশা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আলেম-উলামাদের সঙ্গে ওঠা-বসা করে এমন লোকদেরকেও বর্তমানে তথাকথিত জ্ঞানী সমাজে বেকুব গণ্য করা হয়। অথচ বাস্তবতা হল, শুধুমাত্র সহীহ-শুদ্ধভাবে দেখে দেখে কুরআন পড়তে পারে এমন একজন কারী সাহেবও মুসলিম সমাজের অনেক বড় শিক্ষিত ও মূল্যবান ব্যক্তিত্ব। এটা একমাত্র সেই অনুধাবন করতে পারবে, যে আল্লাহ তা'আলার পাক কালামকে সহীহ-শুদ্ধভাবে পড়ার জন্য দু-চার দিন আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছে। এ অনুভূতি আরো দৃঢ় হবে যদি কেউ ঈমানের মূল ভিত্তি কালিমায়ে শাহাদাত, ঈমানে মুজমাল ও ঈমানে মুফাস্‌সাল, জানাযার দু'আ, দু'আয়ে কুনূত এবং এ জাতীয় জরুরী বিষয়গুলো সহীহ-শুদ্ধরূপে শেখার আগ্রহ করে। আর যদি কেউ এ বিশ্বাসও অন্তরে ধারণ করে যে, মুসলমানের জীবনের প্রতিটি পর্বেই কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট নীতিমালা আছে, যেগুলো সঠিকভাবে জেনে ঠিক ঠিকভাবে আমল না করে মনগড়া পথে চললে পরকালে মুক্তি মিলবে না তাহলে সে-তো কদমে কদমে বিজ্ঞ আলেমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে। আলেমের রাহবারী ছাড়া সে তার চলার পথ সম্পূর্ণ অন্ধকার দেখবে।

ইসলামের পাঁচ বুনিয়াদের একটি হল হজ্জ। কিন্তু কম সংখ্যক মুসলমানের ভাগ্যেই জোটে এ বিধান পালন করার সুযোগ। যাদের জোটে তাদেরও অধিকাংশের জীবনে একাধিকবার হজ্জে যাওয়ার তাওফীক হয় না। পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়া সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী এ ইবাদত পালন করতে গিয়ে অনেক সময় আলেমরাই হিমশিম খেতে থাকে, আর সাধারণ হাজীরা যে কী পরিমাণ হ-য-ব-র-ল ঘটায় এবং কত রকমের ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি নিয়ে দেশে ফিরে তার বর্ণনা দিতে গেলে বিরাট ভলিয়মের প্রয়োজন। সর্বাপেক্ষা মারাত্মক বিভ্রান্তি হল, অজ্ঞদেরকে আলেম মনে করা আর আলেমদেরকে অজ্ঞ মনে করা। হজ্জ সংক্রান্ত এক-দুখানা বাংলা বই পড়ে যেন সকলেই 'মহামুফতী' বনে যায়।

গত হজ্জের সফরেও লক্ষ্য করেছি, যারা তায়াম্মুমের ফরয সম্পর্কেও অবগত নয় এমন হাজী সাহেবরাও আরাফায় যোহর-আসর একত্রে পড়ছে। হজ্জের দিনগুলোতে মুকীম হওয়া সত্ত্বেও নামায কসর পড়ার বিষয় নিয়ে আলেমদের সঙ্গে তর্ক-বাহাসে লিপ্ত হচ্ছে। অতঃপর মন্তব্য ছুড়ে দিচ্ছে, আমাদের দেশের আলেমরা আসলে কিচ্ছুই জানে না।

বস্তুত ডাক্তারের কাছে না গেলে যেমন শরীরের জটিল রোগগুলো সময়মত ধরা পড়ে না, তেমনি আলেমদের সঙ্গে ওঠা-বসা না থাকলে দীনী বিষয়ে জ্ঞানের দৈন্যও ধরা পড়ে না। এজন্যে হজ্জের ইচ্ছা পোষণকারীদের কাছে আরজ, এখন থেকেই কোন বিজ্ঞ আলেমের সঙ্গে দীনী সম্পর্ক স্থাপন করুন। সত্যিকারের ওয়ারিসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলে তিনিই আপনার দীনী বিষয়াদির খোঁজ-খবর নিতে শুরু করবেন এবং আপনার ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের ফিকির করবেন। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই দীনী বিষয়ে আপনি আপনার সঠিক অবস্থান নির্ণয় করতে সক্ষম হবেন।

সাত.

এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে, সর্বগ্রাসী ভেজালের এ যুগে আলেমের মধ্যেও ভেজাল আছে। ভেজালপন্থীরা ভেজালকে এতোটা প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে যে, সাধারণ মুসলমানেরা এখন ভেজালকে মনে করে আসল, আর আসলকে ভেজাল।

জানাশোনা একজন আলেম দীর্ঘদিন থেকে হজ্জের ব্যবসা করেন। আলেম উপাধির ভিত্তিতে সফরে ইমামতিও করেন। মক্কা মুকাররমায় একটু দূরবর্তী বাসা ভাড়া করেন। ফলে যোহরের ও আসরের নামায বাসায় থাকা হাজীদেরকে নিয়ে বাসাতেই আদায় করেন। হজ্জের মূল দিনসমূহের পূর্বেই মক্কায় তাদের পনের দিন থাকা পড়ে। শরীয়ত মতে তিনি ও তার সাথীরা নিশ্চিতভাবে মুকীম। তা সত্ত্বেও তিনি যখন যোহর-আসরে কসর করেন, তখন আমাদের পরিচিত এক ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হুযূর! আমাদের তো হজ্জের আগেই পনের দিন মক্কায় থাকা হচ্ছে, তাহলে আমরা এখানে কসর করছি কেন? তিনি জবাব দিলেন, আমরা তো মক্কায় প্রবেশের সময় মুকীম হওয়ার নিয়ত করিনি। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বললেন, মুকীম হওয়ার নিয়ত কি নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা... বলে করতে হয়? আমরা এখানে পনের দিনের অধিক সময় থাকবো এটাই কি নিয়ত নয়? তখন আলেম সাহেব বললেন, আমরা তো এখানে পনের দিন একাধারে থাকছি না। মাঝে একদিন গারে সাওর, গারে হেরা ইত্যাদি যিয়ারতের জন্য কিছু সময়ের জন্য বাইরে গিয়েছি। এ পর্যায়ে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বললেন, আমার জানা মতে কিছু সময়ের জন্য মক্কার বাইরে যাওয়া আমাদের মুকীম হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক নয়। আপনি কোন মুফতী

সাহেবকে জিজ্ঞেস করে নিন। এ ঘটনায় অন্য সাথীদের প্রায় সকলেই ঐ আলেম সাহেবকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা বলছিলেন, আমাদের হুযূর প্রত্যেক বছর হজ্জে আসেন; উনি কি মাসআলা কম জানেন? আবার মুফতী সাহেবের কাছে যেতে হবে কি জন্যে? পরে অবশ্য আলেম সাহেবের ভুল ভেঙ্গেছে। কিন্তু ততদিনে তো এত লোকের নামায নষ্ট হয়েছে যে, তার সঠিক পরিসংখ্যান আলেম সাহেবের জন্যও কঠিন হবে।

আরেক আলেম সাহেব ব্যালটি হাজীদের গাইড হয়ে হজ্জে গিয়েছেন। তার অধীনস্ত এক হাজী সাহেব ইহরাম অবস্থায় লুঙ্গি পরে গোসল করায় তাকে দিয়ে 'দম' আদায়ের ব্যবস্থা করেছেন। অতঃপর সেই 'দম' -এর গোশত নিজেরাই রান্না করে খেয়েছেন। এ ধরনের বহু দুর্ঘটনা রয়েছে যা এ জাতীয় আলেমরা হাজী সাহেবদেরকে দিয়ে ঘটিয়ে থাকেন।

এজন্য মুহতারাম হাজী সাহেবদের উচিত, আলেমের অনুসরণ করার ক্ষেত্রে আগে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে নেয়া যে, আলেম সাহেব বর্তমানে কি শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য আর মিডিয়া নিয়ে ব্যস্ত আছেন নাকি ইলম-কালামের সাথেও তার সম্পর্ক রয়েছে। সামান্য অন্তর্দৃষ্টি থাকলে আসল নকল বের করা সময়ের ব্যাপার মাত্র; দুরূহ নয়।

আট.

হজ্জের সফরের আজব অভিজ্ঞতা হল, বেশির ভাগ হাজীই কেন যেন মাসআলা বলার জন্য উদগ্রীব থাকেন। পাকিস্তানী হাজীরা তো মনে হয় নিজেদেরকে বিশ্বের সকল হাজীর উস্তাদ মনে করেন। তাওয়াফ চলাকালেও তারা হাজীদের ইহরামের চাদর টেনে ধরেন মাসআলা বলার জন্য। এ রোগে আমাদের দেশের হাজীরাও কম আক্রান্ত নয়। হজ্জ করে আসার পর বই তো লিখবেনই; বরং যাওয়ার আগ থেকেই লেকচার দেয়া শুরু করে দেন।

আমরা সাধারণত এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশন শেষে বিমানে ওঠার পূর্ব মুহূর্তে ইহরাম বাঁধার পরামর্শ দিয়ে থাকি। নিজেরাও তা-ই করি। প্রথম সফরে হাজী ক্যাম্পের মসজিদে গিয়ে পরনের কাপড় পরিবর্তন করে ইহরামের চাদর পরেছি। কিন্তু যেহেতু নিয়ত করে তালবিয়া পড়িনি, এজন্য মাথায় টুপি পরে ছিলাম। এজন্য যে-ই দেখেছে প্রায় সকলেই আমাদেরকে বলছিল, 'হাজী সাহেব! টুপি খুলে নেন, নাহলে দম দেয়া লাগবে।' এয়ারপোর্টের প্রবেশপথে আমার পায়ে দুই ফিতার চামড়ার স্যান্ডেল দেখে একজন তো চিৎকার করে বলেছিলেন, 'এ জুতা চলবে না; স্পঞ্জের স্যান্ডেল লাগবে।' সফরের শুরুতেই এত এত মাসআলার বানে জর্জরিত হয়ে চিন্তা করতে লাগলাম, একযুগ ধরে ফাতাওয়া বিভাগে দায়িত্ব পালনের পরও আমারই যখন এই দশা, তো বেচারা পাবলিকের নাজানি কী অবস্থা?

এয়ারপোর্টের ভেতরে প্রবেশ করে দেখি তালবিয়ার 'মিছিল' চলছে। মিছিল নেই তো তালবিয়াও নেই। অথচ তালবিয়া ব্যক্তিগত আমল। সমস্বরে পাঠ করার আমল নয়। কিন্তু কে শোনে কার কথা? থেমে থেমে মিছিল চলছেই। যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন দেখে-শুনে মনে হল এরাও আলেম মানুষ। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাফেলা নিয়ে মিছিল করে যাচ্ছেন।

ইতোমধ্যে আসরের নামাযের ওয়াক্ত হল। সকলে প্লেনে ওঠার আগেই নামায পড়ে নিতে চাচ্ছেন । কিন্তু অধিকাংশই আসরের নামায কসর পড়ছেন। দু-চারজনকে বললাম, কসর করছেন কেন? প্লেন উড্ডয়নের পূর্বে তো আমরা মুকীমই আছি। উত্তরে তারা এয়ারপোর্টে প্রবেশের পর থেকেই সফর শুরু হওয়ার মাসআলাটা এতোটাই দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন যে, তাদের ভুলটা ধরিয়ে দেয়ার সাহসই হারিয়ে ফেললাম। এ সকল কাণ্ড দেখে মনস্থির করলাম, কেউ গায়ে পড়ে মাসআলা জিজ্ঞেস না করলে এ সফরে আর মাসআলা বলতে যাব না। পুরো সফরে এ সিদ্ধান্তে অটল থাকতে চেষ্টা করেছি। এতে অনেক অযথা তর্ক-বিতর্ক থেকে মুক্তিও পেয়েছি। মাঝে মধ্যে সমস্যা করেছে সাথী-সঙ্গীরা; তারা মাসআলা নিয়ে তর্কে জড়িত হয়ে প্রতিপক্ষকে আমার কাছে ধরে নিয়ে আসতেন। যাদের অনেকেই বলতেন, 'আরে রাখেন আপনের মুফতী সাব! আমরা আরো বড় বড় মুফতীর কাছ থেইকা মাসলা জাইনা আইছি।' আমি তখন মাসআলা বলার পরিবর্তে আমার সাথীকেই নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছি। সে বছর মদীনা মুনাওয়ারা থেকে ফেরার পথে আসর পড়ে বাসে উঠলাম। মদীনায় থাকতেই মাগরিবের ওয়াক্ত হয়ে গেল। কিন্তু ড্রাইভার আমাদেরকে নামতে দিচ্ছে না। একসময় অন্ধকার ঘন হয়ে গেল। কিন্তু সে চালিয়েই যাচ্ছে। গাড়ি থামানোর কথা বললে জবাব দিচ্ছে, ছবর! ছবর! আমি বারবার 'আল-ফজর' ঘড়িতে নামাযের শেষ সময় দেখছি আর সাথীদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছি– এখনো ৪০ মিনিট বাকী আছে, এখনো ৩০ মিনিট বাকী আছে...। কিছু সাথীর পক্ষে আর সবর করা সম্ভব হল না। তারা বাসের সিটে বসে ইশারায় নামায পড়ে নিল। ২০ মিনিট সময় অবশিষ্ট থাকতে যখন ড্রাইভার গাড়ি থামাল তখন আমরা নেমে জামাআতে নামায পড়ে নিলাম। নামায আমিই পড়ালাম। যারা বাসের ভেতর বসে বসে নামায পড়েছে তারা কেউ নামেননি এবং নামায দোহরাননি। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, আমরা নামায শেষে বাসে উঠে শুনতে পেলাম, তারা বলাবলি করছেন, আমাদের নাকি নামায হয়নি। আমার সঙ্গে যারা নেমে যথারীতি নামায পড়েছে তারা আমাকে লক্ষ্য করে বলে, হুযূর! এরা কি কয়? আমাদের নামায নাকি হয়নি? আমি তাদেরকে বললাম, চুপ থাকেন। মনে মনে ভাবলাম, হায় কপাল! ওয়াক্ত বাকী থাকা সত্ত্বেও অযথা বাসে বসে নামায পড়ার কারণে নামায নষ্ট হল কার, আর শুনতে হচ্ছে কার!

হজ্জের কুরবানীর জন্য ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে পাথর মারার পূর্বে কুরবানীর সময় চলে যাওয়ার ঘটনাও সে বছর আমাদের কিছু সাথীর ক্ষেত্রে ঘটেছিল। ব্যাংক তাদেরকে সময় দিয়েছে সকাল সাড়ে এগারোটায়; কিন্তু তারা ১০ তারিখ সকালে মুযদালিফা থেকে এসে মিনার তাবুতে প্রবেশের পর মু'আল্লিম তাবুর গেটে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। ফলে তারা বিকাল তিনটার পূর্বে আর বের হতে পারেননি; পাথর মেরেছেন বিকাল চারটার পর। নিয়ম অনুযায়ী তাদের দম আসার কথা। দমের কথা শুনে তারা বললেন, এটা মু'আল্লিমের দোষ, আমরা দম দিতে পারবো না। ব্যাংকে টাকা জমা দেয়ার কারণেই যে এ বিপত্তির শিকার হতে হল এটা তারা মানলেনই না।

নয়.

সরকারী ব্যবস্থাপনায় হজ্জ করতে যাওয়ায় সে বছর কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু আমার অভ্যাস বশত তাদের কারো নাম-ঠিকানা ও ফোন নম্বর সংগ্রহ করে রাখিনি। তাদের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল ভি.আই.পি বাসায় সিট পাওয়ার কারণে। আর সাময়িকভাবে ভি.আই.পি হওয়ার সুযোগ হয়েছিল আমার শ্রদ্ধেয় সফরসঙ্গী সরকারী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত এক প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের কারণে। তিনি

আমাদের তিনজনের একজন। তিনি ছিলেন হজ্জ ব্যবস্থাপক হাসান জাহাঙ্গীর সাহেবের মামা-শ্বশুর। কালো বর্ণের মানুষটির ভেতরটা প্রয়োজনের চেয়েও বেশি সাদা। তার মনের অতিশুভ্রতা ও অতিসরলতা কয়েকবার আমাকে ক্ষুব্ধও করেছিল। অপর সাথীও ছিলেন সরল প্রকৃতির বয়স্ক মানুষ; কিন্তু কর্মচঞ্চল। কিছু না কিছু ব্যস্ততা তার থাকতেই হবে। আমাদের তিনজনের সামষ্টিক কাজগুলো তিনি একাই করতে চেষ্টা করতেন। আর কোন কাজ না পেলে তিনি হাঁটতে থাকতেন। তিনজন একত্রে বের হলে তিনি চলে যেতেন আগে এবং অল্পক্ষণেই আমাদেরকে হারিয়ে ফেলতেন। আর প্রিন্সিপ্যাল সাহেব পড়ে থাকতেন পেছনে। আমি মাঝখানে থেকে একজনের গতি কমানোর চেষ্টা করতাম আর অপরজনকে বাড়ানোর তাগিদ দিতাম। সামনে পেছনে উভয়দিকে নযর রাখতে বাধ্য হতাম। যেন দু'জনের কেউ বিচ্ছিন্ন হয়ে না যান। পেছনের জনকে সঙ্গে রাখার জন্য আমাদের গতি ধীর হলে তিনি আনুপাতিকভাবে আরো ধীরে হাঁটতেন। ফলে হাঁটা আর একসঙ্গে হয়ে উঠতো না। সে চিত্র মনে হলে এখনও হাসি পায়। বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে আমার নেতৃত্ব-সুলভ আচরণে তারা কষ্ট পেয়ে থাকলে আমাকে যেন মন থেকে মাফ করে দেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অভিমান করে পদত্যাগকারী এন.বি.আর-এর চেয়ারম্যান জনাব বদিউর রহমান সাহেব আমাদের পার্শ্ববর্তী কামরায় থাকতেন। সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের পরপরই তিনি আমার প্রতি আস্থাশীল হয়ে পড়েছিলেন। হজ্জের সকল আমলে আমাকে অনুসরণ করতেন। আমাকে উদ্ধৃত করতেন 'আমার মুফতী সাব' বলে। মাসাইলের ক্ষেত্রে সাথীদের কেউ আমার সঙ্গে দ্বিমত করলে তিনি তাকে আঁতেল উপাধি দিতেন। উচ্চপদস্থ একজন সরকারী কর্মকর্তা ব্যক্তি জীবনে কতটা সাধাসিধা হতে পারে তা বোঝার জন্য দু'টি উদাহরণই যথেষ্ট। প্রথমটি হল, যাওয়া-আসা উভয় যাত্রায় তার লাগেজ বলতে ছিল একটিমাত্র হাতে বহনযোগ্য ব্যাগ। দ্বিতীয়টি হল, ১২ যিলহজ্জ মিনা থেকে ফেরার সময় হাতের সামান যেন একেবারেই হাল্কা থাকে সেজন্য তিনি পাজামার উপর প্যান্ট আর শার্টের উপর শার্ট পরে নিয়েছিলেন। এ দৃশ্য স্বচক্ষে না দেখলে আমিও বিশ্বাস করতাম না। দেশে ফেরার পর এ মহৎ ব্যক্তিটি যদি ভালো কোন আলেমের সংস্পর্শ পেয়ে থাকেন তাহলে দীনী দিক থেকে অনেক অগ্রসর হয়ে গেছেন বলে আমার ধারণা। আল্লাহ তা'আলা আমার এ সুধারণা বাস্তবে পরিণত করুন।

দশ.

কোন দুর্ঘটনায় তাৎক্ষণিক ইন্না-লিল্লাহ পড়ার ফযীলত হল, বড় ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া, কিংবা সংঘটিত ক্ষতির উপস্থিত সমাধান হওয়া, অথবা ক্ষতির উত্তম প্রতিদান পাওয়া। ঈমান-আমলের দুর্বলতা সত্ত্বেও এ অধমের নিজ জীবনে এর বহু বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে। একটি ঘটনা তো চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রথম হজ্জের সফরে ৯ যিলহজ্জ দিবাগত রাত। আমরা তিন সাথী মুযদালিফায় উকূফ করলাম মাশ'আরুল হারাম মসজিদের একদম নিকটে। মাগরিব-ইশা মসজিদেই পড়তে চেয়েছিলাম। কিন্তু শুয়ে থাকা হাজীদের ভিড়ে জায়গা না পেয়ে নিকটেই ময়দানে নামাযান্তে আরাম করলাম। আউয়াল ওয়াক্তে ফজর পড়ে উকূফ শেষে ১০ যিলহজ্জ পাথর মারার জন্য মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। মূল রাস্তার পাশে পূর্ব-পশ্চিমে পুরো মুযদালিফা জুড়ে কোমর সমান গভীর একটা ড্রেন ছিল। দু'পাশ খাড়াভাবে পাকা করা সে ড্রেনে কোন পানি ছিল না। আমরা সেই ড্রেনের পাড় দিয়ে হেঁটে কিং-ফয়সাল ব্রিজের দিকে এগুচ্ছি। এমন সময় হঠাৎ আমাদের একজন পা ফসকে ড্রেনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই ইন্না-লিল্লাহ পড়লাম বটে, কিন্তু আতঙ্কিত হলাম এই ভেবে যে, আজ বুঝি কপালে ভোগান্তি আছে। বৃদ্ধ এ সাথীর হাত-পা কিছু একটা যদি ভেঙ্গে থাকে তাহলে আজ পাথর মারা, কুরবানী করা, তাওয়াফ করার কি হবে? এগুলো করবো, নাকি তাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবো? অনবরত ইন্না-লিল্লাহ পড়তে পড়তে দু'জনে মিলে তাকে টেনে উঠালাম। আশ্চর্য! দেখি তিনি একদম সুস্থ। কোথাও একটু আঁচড়ও লাগেনি। দিব্যি হাঁটতে পারছেন। সে সময় যে কী পরিমাণ খুশি লাগছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। অন্তর থেকে আল্লাহ তা'আলার শোকরিয়া বের হল। আর ইন্না-লিল্লাহ'র প্রতি ইয়াকীন আরো মজবুত হল। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত দু'আ ও আমলসমূহ মজবুত ইয়াকীনসহ অভ্যাসে পরিণত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

(চলবে ইনশা-আল্লাহ)

লেখক : নায়েবে মুফতী,
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর,
ঢাকা

(০২ পৃষ্ঠার পর; সম্পাদকীয়)

আর নিজেদের অশুদ্ধ ও মনগড়া দুরূদের সম্মানে দাঁড়ানোকে জরুরী মনে করে তারাই নাকি খাঁটি নবী প্রেমিক। কী আজব ভালোবাসা! কী অদ্ভুত নবীপ্রেম? কুরআনে পাকের সূরা আ'রাফের ১৮৮নং আয়াতে, সূরা আনআমের ৫০ ও ৫৯নং আয়াতে, সূরা ইউনুসের ২০নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়ে ঘোষণা করিয়েছেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়ব জানেন না। জানলে নিজের পাশে বসা সাহাবীকে তিনি বিষ মাখা গোশত খেতে দিতেন না; নিজেও মুখে দিতেন না। বীরে মাউনার কাছে নিয়ে নির্মমভাবে শহীদ করার জন্য সত্তর জন ক্বারী সাহাবীকে কয়েকজন প্রতারকের হাতে তুলে দিতেন না। হুদাইবিয়ায় অবস্থানকালে হযরত উসমান রাযি. এর শহীদ হওয়ার গুজব বিশ্বাস করে প্রতিশোধের জন্য সাহাবীদের কাছ থেকে আমৃত্যু লড়াইয়ের জন্য বাইআত গ্রহণ করতেন না। নিজের পাশে বসা উটের নিচে হযরত আয়েশার গলার মালা পড়ে থাকা অবস্থায় মালা তালাশ করার জন্য সাহাবীগণকে অন্যত্র পাঠাতেন না। এমন অসংখ্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও পবিত্র কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্যের বিরোধিতা করে যারা বলে, নবীজী গায়েব জানতেন, তিনি সর্বত্র হাযির নাযির আছেন– তারা নাকি নবীজীর খাঁটি প্রেমিক; এ প্রেমিকেরা সুন্নাতে নববী বর্জন করে শুধু প্রেমের দাবীতে পার পাওয়ার নেশায় এতটা অন্তরকানা যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জিযাসমূহকে তাঁর গাইব জানার ও হাযির-নাযির হওয়ার প্রমাণ হিসেবে খাড়া করে। অথচ বেওকুফেরা একবারের জন্যও চিন্তা করে না যে, তিনি হাযির নাযির ও আলিমুল গায়ব হলে কতগুলো ঘটনায় তিনি নিজ সাহাবীদের হত্যাকাণ্ডের পরোক্ষ সহযোগী হয়ে যান। কত ঘটনায় তিনি অনর্থক কাজ করেছেন বলে সাব্যস্ত হন। কত ক্ষেত্রে তিনি জেনেও না জানার ভান করে সাথীদেরকে অযথা হয়রানী করার দায়ে অভিযুক্ত হন। এটা কি নবীজীকে দোষী সাব্যস্ত করার ইচ্ছাকৃত ষড়যন্ত্র, নাকি শুধু মিথ্যা প্রেমের দাবীকে মূর্খদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করে নিজেদের রুটি-রুজি অর্জনের কূটকৌশল তা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে এমন অসঙ্গত ও পাপপূর্ণ প্রেম থেকে রক্ষা করে সঙ্গত ও খাঁটি প্রেমিক হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম-৬

মাওলানা আব্দুল মালেক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হযরত ঈসা আ.

পবিত্র কুরআনে কারীমে (সূরা আলে ইমরান- ৩৫-৪৭) হযরত ঈসা আ. এর মাতা হযরত মারইয়াম আ. এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। মারইয়াম আ. এর পিতা ইমরান ছিলেন বাইতুল মুকাদ্দাসের ইমাম। মাতা বিবি হান্না মানত করেছিলেন যে, তার কোনো সন্তান হলে তাকে বাইতুল মুকাদ্দাসের খিদমতের জন্য উৎসর্গ করবেন। যখন ছেলের পরিবর্তে কন্যা (মারইয়াম) জন্মগ্রহণ করল তখন বিবি হান্না কিছুটা দুঃখিত হলে আল্লাহ তা'আলা তাকে এ মর্মে সান্ত্বনা দিলেন যে, এ কন্যা বড় ভাগ্যবতী হবে। যাকারিয়া আ. ছিলেন মারইয়াম আ. এর খালু। জন্মের পূর্বেই পিতা ইমরানের ইন্তেকালের কারণে যাকারিয়া আ. তার লালন-পালনের দায়িত্ব নেন। আল্লাহ তা'আলার কুদরতে অসময়ে মারইয়াম আ. বিভিন্ন ফল খেতেন। পরবর্তীতে তারই গর্ভ হতে পিতা ছাড়া কেবল আল্লাহ তা'আলার 'কুন' শব্দের মাধ্যমে হযরত ঈসা আ. জন্মগ্রহণ করেন। (কাসাসুল আম্বিয়া; পৃষ্ঠা ৪৪৯)

হযরত ঈসা আ. ছিলেন বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত সর্বশেষ নবী। ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে ১ম খ্রিস্টাব্দে ফিলিস্তিনের বাইতুল লাহম (বেথেলহেম) অঞ্চলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৯ খ্রিস্টাব্দে নবুওয়াত প্রাপ্ত হন।

নবুওয়াতের নিদর্শন স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাকে অনেক মু'জিযা দান করেছিলেন। যেমন, তার হাতের স্পর্শে দুরারোগ্য ব্যাধি ভালো হয়ে যেতো, কুষ্ঠ রোগী আরোগ্য লাভ করতো, তার হুকুমে মৃত ব্যক্তি জীবিত হতো। তিনি জন্মগ্রহণের পরপরই মায়ের কোলে মায়ের পবিত্রতা এবং নিজের নবুওয়াতের ঘোষণা করেন এবং স্বল্পসংখ্যক ঈমান আনয়নকারী হাওয়ারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে তার দু'আর ফলে আল্লাহ তা'আলা আসমান হতে রং বেরংয়ের খাদ্যপূর্ণ দস্তরখান অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ তা'আলা তার উপর ইঞ্জিল কিতাব অবতীর্ণ করেন।

এতদসত্ত্বেও বনী ইসরাঈলের ইয়াহুদীরা তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। কিন্তু তাদের বিভ্রম হল। অপর এক ব্যক্তিকে ঈসা মনে করে তাকেই শূলে চড়িয়ে দিল। এদিকে আল্লাহ তা'আলা ঈসা আ. কে আসমানে উঠিয়ে নিলেন। আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় (সূরা নিসা- ১৫৭) ঈসা আ. এর জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠে যাওয়ার ঘটনা কুরআনে কারীমে বর্ণনা করেছেন।

শেষ যামানায় তিনি পুনরায় দুনিয়াতে আগমন করবেন। দাজ্জালকে হত্যা করবেন। শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত মতে জীবন যাপন করবেন এবং স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন। (সূরা আলে ইমরান- ৪৪-৪৯, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ২/৫৯, আলকামেল ১/২৩৬)

খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে, ঈসা আ. কে ক্রুশকাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে। অথচ এটা নিছক একটি ধারণা বৈ কিছুই নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন। (সূরা নিসা- ১৫৭)

তাদের কথিত ইঞ্জিলে শতসহস্র বিকৃতি সত্ত্বেও যতটুকু সত্যের আভাস এখনো রয়ে গেছে, তা-ও প্রমাণ করে যে, ঈসা আ. কে হত্যা করা হয়নি; বরং ঈসা আ. এর মনোনীত বারজন শিষ্যের একজন বিশ্বাসঘাতকতা করে ঈসা আ. কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাকেই ঈসা আ. এর আকৃতি দান করেন। ফলে ইয়াহুদীদের ভ্রম হয়েছিল, ঈসা আ. এর পরিবর্তে তারা সেই বিশ্বাসঘাতককেই হত্যা করেছিল। আর ঈসা আ. কে আল্লাহ তা'আলা আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যান। পাঠক! এ মর্মে ইঞ্জিলের বর্ণনাগুলো লক্ষ্য করুন-

[ইয়াহুদী] প্রধান ইমামেরা ও আলেমেরা ঈসাকে গোপনে মারিয়া ফেলিবার উপায় খুঁজিতেছিলেন, কারণ তাহারা লোকদের ভয় করিতেন। এই সময় এহুদা [জুদাস]- যাকে ইস্কারিয়োৎ বলা হইত- তাহার ভিতরে শয়তান ঢুকিল। এই এহুদা ছিল ঈসার বারজন সাহাবীর মধ্যে একজন।... বিশ্বাসঘাতক জুদাস মাত্র ত্রিশটি রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে ঈসা আ.কে শত্রু হস্তে ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে।... ঈসা আ. যখন জানতে পারলেন, তখন গেৎশিমানী বাগানে গিয়ে আশ্রয় নিলেন এবং অবশিষ্ট ১১ জন শিষ্যের আটজনকে মোতায়েন করে বললেন, আমি ঐখানে গিয়া যতক্ষণ মুনাজাত করি, ততক্ষণ তোমরা এখানে বসিয়া থাক...

এরপর ঈসা আ. দুআ করতে লাগলেন, '(হে ঈশ্বর!) তোমার নিকট তো সমস্তই সম্ভব। এই দুঃখের [গুপ্ত হত্যার] পেয়ালা আমার নিকট হইতে তুমি লইয়া যাও...।' ঈসা আ.এর প্রত্যক্ষ্যদর্শী সাহাবা বার্নাবাস লিখেছেন, 'জুদাস ইয়াহুদী শত্রু ও রোমীয় সৈন্যদেরকে নিয়ে ঈসা আ.এর অবস্থানের নিকট আসিতেছিল। তিনি বহু লোকের আগমনের সংবাদ শুনে ভয়ে ঘরের দিকে প্রস্থান করলেন। তার এগারজন সাহাবা নিদ্রা যাচ্ছিলেন। আল্লাহ তার প্রধান চারজন ফেরেশতা-জীব্রাইল, মীকাইল, ইস্রাফীল ও আজরাইল আ. কে আদেশ করলেন ঈসা আ. কে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য। পবিত্র ফেরেশতারা দক্ষিণ দিকের জানালা দিয়ে ঈসা আ. কে সশরীরে বের করে নিয়ে গেলেন। তাঁরা তাকে তৃতীয় আসমানে নিয়ে গেলেন। ... জুদাস আবেগপ্রবণ হয়ে দ্রুতগতিতে সর্বাগ্রে কক্ষের সেই স্থানে পৌঁছল, যেখান হতে যীশুকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সূক্ষ্মদর্শী ও সুকৌশলী আল্লাহ তা'আলা বিস্ময়করভাবেই তার কার্য সম্পাদন করেছিলেন। যার ফলে জুদাস আকার আকৃতি ও ভাষায় হুবহু যীশুর মত এরূপ পরিবর্তিত হয়েছিল যে, আমরা নিঃসন্দেহে তাকেই ঈসা বলেই বিশ্বাস করছিলাম। সে আমাদেরকে নিদ্রা হতে জাগ্রত করে জিজ্ঞেস করল, 'গুরু কোথায়?' আমরা আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'আপনিই প্রভু! আপনিই তো আমাদের প্রভু! আপনি কি এখন আমাদেরকে ভুলে

গেলেন?' মুচকি হেসে জুদাস উত্তর দিল, 'এখন তোমরা এমন বোকা হয়েছ যে, আমাকে জুদাস ইস্কারিয়োৎ বলেও চিনতে পারছ না।' জুদাস যখন এভাবে কথা বলছিল, সৈন্যদল সেখানে ঢুকে পড়ল এবং জুদাসকে পাকড়াও করল। কারণ সর্বদিক দিয়ে সে তখন অবিকল যীশুর মতই হয়েছিল...!'

বলা বাহুল্য, এরপর যীশুর আকৃতিধারী জুদাসকেই তারা যীশু মনে করে ক্রুশে ঝুলিয়েছিল। (লূক ২২:২-৩, ৪১, ৪২, মথি ২৬:১৪-১৬, ৩৬-৩৯ এবং মার্ক ১৪:৪৩-৫২, মার্ক ১৪: ৩৫-৩৬, বার্নাবাস লিখিত সুসমাচার; অধ্যায় নং ২১৫-২১৬)

আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে মানবজাতির হেদায়াত ও জান্নাতপ্রাপ্তির পথ নির্দেশনার জন্য অসংখ্য নবী-রাসূল পৃথিবীর বুকে পাঠিয়েছেন। প্রত্যেক যুগে আল্লাহর হুকুম সে যুগের নবীর তরীকা মত পালন করাই ছিল নাজাত ও মুক্তির একমাত্র পথ। এক নবীর যুগে পূর্ববর্তী কোনো নবীর অনুসরণ করার অর্থ হলো বর্তমান নবীকে অস্বীকার করা এবং প্রকারান্তরে নিজেকে খোদাদ্রোহী সাব্যস্ত করা! উপরন্তু যদি পূর্বের নবীর সংবিধান তথা শরীয়তগ্রন্থ বিকৃত হয়ে যায় এবং পূর্বের নবীর প্রকৃত ধর্ম স্বার্থান্বেষী বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষের কবলে পড়ে স্বরূপ হারিয়ে অসার, স্ববিরোধিতাপূর্ণ, বরং মূল ধর্মের বিপরীতমুখী অনৈতিক, অযৌক্তিক শিক্ষায় পুষ্ট হয়ে একটি বিকৃত আনুষ্ঠানিকতার রূপ পরিগ্রহ করে, তখন তো বর্তমান সত্য ধর্মের উপস্থিতিতে সে বিকৃত ধর্মের অনুসরণ সুস্থ মস্তিষ্কের যুক্তিতেও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় না।

আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের পর পূর্বের সকল নবীর ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ পূর্বের কোনো নবীর শরীয়ত বা সংবিধান আর এখন কার্যকর নয়। উপরন্তু পূর্ববর্তী নবীগণের ধর্মগ্রন্থ যেমন অবিকৃত নেই, তেমনি তাদের প্রকৃত শিক্ষাও স্বার্থান্বেষী মানুষের সংযোজন, বিয়োজন আর তথাকথিত সম্পাদনা-পরিমার্জনার দরুন বিকৃতির কবলে পড়ে প্রচ্ছন্ন হয়ে গেছে। কাজেই আখেরী নবীর আগমনের পরে পূর্বের কোনো নবীর অনুসরণ আর এখন বৈধ নয়।

তাছাড়া প্রচলিত খ্রিস্টধর্ম হযরত ঈসা আ.এর প্রকৃত ধর্ম নয়; বরং তা জনৈক ইয়াহুদী সেন্ট পল-এর মতবাদ। ঈসা আ.এর অন্তর্ধানের পর তার অনুসারীরা দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। তাদের একটি হল জুডিও খ্রিস্টান (Judeo Christian), আর একটি হলো পৌলিয়ান খ্রিস্টান (Pauline Christian)। ঈসা আ.এর মনোনীত সাহাবাদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল জুডিও খ্রিস্টান সম্প্রদায়। সেন্ট পল কর্তৃক যখন খ্রিস্টধর্ম বিকৃত হয়ে যায়, তখন তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে পৌলিয়ান খ্রিস্টান। (সত্যের সন্ধানে; পৃষ্ঠা ৮২)

সেন্ট পল

সেন্ট পলের ইয়াহুদী নাম ছিল শল (Saul)। সে ছিল একজন কট্টর ইয়াহুদী এবং হযরত ঈসা আ. ও তার সাহাবাদের ঘোরতর শত্রু। ঈসা আ.এর মনোনীত বারজন শিষ্যের তালিকায় তার নাম নেই। (মথি ১০:১-৪, লূক ৬:১৩-১৬, প্রেরিত ১:১৩, এবং বার্নাবাস লিখিত ইঞ্জিলের ১৪নং অধ্যায়) ঈসা আ.এর অনুসারীদের অত্যাচার করার ক্ষেত্রে সিদ্ধহস্ত হওয়ার স্বীকৃতি সে নিজেই দিয়েছে। (দেখুন গালাতীয় ১:১৩, খ্রিস্টান মুসলিম সংলাপ; পৃষ্ঠা ৮১)

সেন্ট পল যখন দেখল, নির্যাতন-উৎপীড়নের মাধ্যমে খ্রিস্টধর্মকে বিকৃত করা সম্ভব নয়, তখন প্রথমত সে ঈসা আ. এর প্রকৃত অনুসারীদের আস্থা অর্জন করে। এরপর নিজেকে খ্রিস্টান প্রকাশ করে ঈসা আ. ত্রয়োদশতম মনোনীত শিষ্য দাবী করে। (প্রেরিত ২৬:১৪) অথচ বাইবেলে এ ঘটনার বিবরণে যে অসঙ্গতি ও স্ববিরোধিতা রয়েছে, তাতে প্রমাণ হয় যে, পলের এ দাবী ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। অনেক আধুনিক বাইবেল পণ্ডিতই পলের শিষ্যপদ লাভ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেছেন। (দেখুন জার্মান পণ্ডিত ড. মিয়ারের মন্তব্য 'যীশু না সেন্ট পল?'; পৃষ্ঠা ১২২) একপর্যায়ে ঈশ্বরের নিকট হতে ওহী প্রাপ্তিরও দাবী করে বসল (গালাতীয় ১:১২) এবং নিজেকে নবীর আসনে আসীন করে ঈসা আ. এর শিক্ষা বিরোধী নিজস্ব বিকৃত ধ্যান-ধারণাকে খ্রিস্টধর্ম বলে প্রচার করতে লাগল। (গালাতীয় ২:২, ৪, সত্যের সন্ধানে; পৃষ্ঠা ৯৩)

জুডিও খ্রিস্টানরা পৌলের স্বরূপ বুঝতে পেরে তাকে পরিত্যাগ করল। ঈসা আ. এর মনোনীত শিষ্য বার্নাবাস পলের স্বরূপ উদ্ঘাটনের নিমিত্তে ঈসা আ. এর বাণী সংকলন করেন এবং তার ভূমিকায় পলকে প্রবঞ্চিত ব্যক্তি আখ্যায়িত করেন। (বার্নাবাসের বাইবেল; ভূমিকা ও উপসংহারের মধ্যে ১নং অধ্যায় হতে ২২১নং অধ্যায়ের মূল পাঠ দ্রষ্টব্য, সত্যের সন্ধানে; পৃষ্ঠা ৭৮)

সেন্ট পল তার দল ভারী করার জন্য ঈসা আ.এর তাওহীদের ধর্মে শিরকের মিশ্রণ ঘটিয়ে তাকে মানুষের কামপ্রবৃত্তির অনুসারী করে সস্তায় স্বর্গে যাওয়ার সনদ দিয়ে দিলেন। ফলে গ্রীস রোম ও প্রভৃতি দেশের জনগণ যারা ঈসা আ.এর ধর্ম কঠিন মনে করে গ্রহণ করত না, সহজে মুক্তির প্রত্যাশী এ সকল অ-ইয়াহুদীরা এবং প্রতিমাপূজারীরা দলে দলে পৌলের ধর্মে দীক্ষিত হতে লাগল। ৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গীর্জাসমূহ জুডিও খ্রিস্টানদের দখলে থাকলেও এরপর থেকে সেন্ট পলীয়দের দল ভারী হতে লাগল। অবশেষে এমন সময় আসল যখন শাসনকর্তারা তাদের শাসনক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ সেন্ট পলীয় খ্রিস্টানদের ধর্মমতকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিল। অবশেষে ঈসা আ. উর্ধ্বারোহণের ৩২৫ বছর পর সম্রাট কনস্টান্টাইনের শাসনামলে নেসিয়া/নিকিও কাউন্সিল কর্তৃক জুডিও খ্রিস্টান ও সেন্ট পলীয় খ্রিস্টানদের একটি বাহাসের আয়োজন করা হয়। সম্রাট তার শাসনক্ষমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ পৌলীয় দলের প্রতিনিধি যাজককে বিজয়ী ঘোষণা দেন। ফলে জুডিও খ্রিস্টানদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। এরপর যে সকল জুডিও খ্রিস্টান পল-পন্থীদের বিকৃত মতবাদে বিশ্বাস করত না, তাদের উপর বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড চলতে থাকে এবং জুডিও খ্রিস্টানদের অনুসৃত ইঞ্জিলসমূহকে পুড়িয়ে ফেলা হয়। একপর্যায়ে ঈসা আ. এর প্রকৃত অনুসারীরা দুনিয়ার বুক থেকে বিলীন হয়ে যায় এবং ঈসা আ.এর ধর্মমতের স্থান দখল করে নেয় সেন্ট পলবাদ। (দ্র. ড. মরিস বুকাইলি; বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান; পৃষ্ঠা ৮৯)

এ সত্য ইতিহাসের কারণে অনেক খ্রিস্টান পণ্ডিতও এটা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, সেন্ট পল হলো ইঞ্জিল এবং প্রকৃত খ্রিস্টধর্মের বিকৃতকারী। এ ক্ষেত্রে খ্রিস্টান পণ্ডিত Heinez Zahrnt এবং ড. মরিস বুকাইলির বক্তব্য লক্ষ্যণীয় (দ্র. Jesus Report, Johannes Lehman; page 126 এবং বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান; পৃষ্ঠা ৮৮)

ঈসা আ. এর শিক্ষা ও সেন্ট পলের মতবাদের মাঝে বিরোধ

হযরত ঈসা আ. এর ধর্ম ছিল হযরত মূসা আ.এর ধর্মের সম্প্রসারিত রূপ। সেন্ট পল সর্বপ্রথম হযরত মূসা আ. এর শরীয়তকে বাতিল ঘোষণা করে। (দ্র. গালাতীয় ৫:৪, খ্রিস্টান মুসলিম সংলাপ; পৃষ্ঠা ২৬) শুধু তাই নয়; বরং সে নবীগণের সকল শরীয়তকেই বাতিল ঘোষণা করে দিয়ে বলে, *খোদার শরীয়ত খোদার গজব ডেকে আনে। আর সত্য কথা বলতে কি, যেখানে শরীয়ত নেই, সেখানে শরীয়ত অমান্য করিবার প্রশ্নও নেই।* (দ্র. রোমীয় ৪:১৫)

এরপর সে কেবল হযরত ঈসা আ.এর নয়; বরং সকল নবীগণের শিক্ষার বিপরীতে বিকৃত আকীদা-বিশ্বাসের অনুপ্রবেশ ঘটায়। যাকে অবলম্বন করে আজকের খ্রিস্টসমাজ স্বর্গপ্রাপ্তির মিথ্যা প্রবঞ্চনায় আত্মভোলা হয়ে আছে। সেন্ট পলের এ সকল বিকৃত আকীদাসমূহের মধ্য হতে তিনটি বিশ্বাস অন্যতম-

১. ত্রিত্ববাদ। ত্রিত্ববাদের মর্ম হল তিন খোদায় বিশ্বাস। পিতা, পুত্র আর পাক রুহ। এ তিনজনই খোদা। আর এ তিনের সমষ্টি এক খোদা। বর্তমান খ্রিস্টানরা সকলে এ আকীদা পোষণ করে। (বাইবেল বিকৃতি; পৃষ্ঠা ৩০)

২. পুত্রত্ব। সেন্ট পল কর্তৃক বিকৃত খ্রিস্টধর্মের আরেকটি আকীদা হল, ঈসা আ. আল্লাহর পুত্র ছিলেন! [নাউযুবিল্লাহ] (প্রেরিত ৯:২০)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন স্থানে বিশেষত সূরা ইখলাসে সুস্পষ্ট ভাষায় মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি পিতৃত্ব ও পুত্রত্বের গুণ হতে পবিত্র। এ আয়াতে ঈসা আ. যে আল্লাহর পুত্র ছিলেন না, বরং তার বান্দা এবং পয়গম্বর ছিলেন, তাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণনা করেছেন। (সূরা নিসা- ৭১, ৭২)

৩. পাপমোচনের বিশ্বাস। হযরত ঈসা আ.এর শিক্ষার বিপরীতের সেন্ট পল তৃতীয় যে মতবাদটি দাঁড় করায় তা হলো *'যীশু ক্রুশকাষ্ঠে প্রাণ দিয়ে সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গিয়েছেন।* (রোমীয় ৫:৮, ১২-১৯) *তিনি তার ক্রুশের উপর মেরে ফেলা দেহের মধ্য দিয়ে সমস্ত হুকুম ও নিয়মসুদ্ধ মূসার শরীয়তের শক্তি বাতিল করেছেন। কেননা, শরীয়ত দ্বারা পাপের জ্ঞান জন্মে।* (রোমীয় ৩/২০) (খ্রিস্টান মুসলিম সংলাপ; পৃষ্ঠা ১২)

এ আকীদাকে বর্তমান খ্রিস্টধর্মের প্রাণ মনে করা হয়। খ্রিস্টানদের এ বিশ্বাসের সারকথা হলো, আদম আ. পাপ করেছিলেন (নাউযুবিল্লাহ) নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে। আদিপিতার পাপের কারণে সমস্ত বনী আদম পাপী হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা ঈসা আ.এর ক্রুশারোহণের ব্যবস্থা করে বনী আদমের সেই আদিপাপ এবং আদিপাপের কারণে আরো যত পাপ তারা করেছিল এবং ভবিষ্যতে করবে, তা সব মাফ করে দিয়েছেন! কাজেই মুক্তির জন্য শরীয়ত মানার কোন দরকার নেই। দেখুন; খ্রিস্টান পণ্ডিত Martin Luther (ক্যাথলিক হেরাল্ড ৯/২৭৭)

অথচ খ্রিস্টানদের কথিত বাইবেলেই রয়েছে পাপমোচন বিশ্বাসের বিপরীতে প্রভু ও ঈসা আ. এর বক্তব্য। পাঠক লক্ষ্য করুন!

প্রভু বলেন, 'সন্তানের জন্য পিতার কিংবা পিতার জন্য সন্তানের প্রাণদণ্ড করা যাইবে না। প্রতিজন আপন আপন পাপ প্রযুক্তই প্রাণদণ্ড ভোগ করিবে। (দ্বিতীয় বিবরণ ২৪:১৬, সত্যের সন্ধানে; পৃষ্ঠা ১২৭) তাহলে বলুন, পিতা আদমের জন্য সন্তান ঈসার প্রাণদণ্ড কীভাবে বৈধ হতে পারে?

ঈসা আ. বলেন, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস ও ব্যক্তিগত সৎকর্ম মুক্তি পাওয়ার ভিত্তি। (দ্বিতীয় বিবরণ ২৪:১৬ এবং যিহিস্কেল ১৮:২০, খ্রিস্টান মুসলিম সংলাপ; পৃষ্ঠা ১১)

পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন যে, কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না এবং সৎকর্মশীলদের জন্যই রয়েছে জান্নাত। (সূরা আনআম- ৬৪, সূরা কাহাফ- ১০৭)

উল্লিখিত তিনটি কুফরী আকীদা ছাড়াও সেন্ট পল ঈসা আ.এর তাওহীদ ও একত্ববাদের ধর্মকে ধ্বংস করার স্বার্থে অসংখ্য বিভ্রান্তিকর আকীদার সংযোজন করে। সেন্ট পলের পরবর্তী খ্রিস্টজগত ঈসা আ.এর প্রকৃত তাওহীদী আদর্শের অনুসারী নয়। বরং তারা সেন্ট পলের কুফরী আকীদায় বিশ্বাসী। এ কারণেই কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা একাধিক খোদায় বিশ্বাসী এ সকল ইয়াহুদী খ্রিস্টানদেরকে মুশরিক এবং কাফের আখ্যা দিয়েছেন। তাদেরকে আল্লাহ ও মুসলমানদের শত্রু সাব্যস্ত করে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেও নিষেধ করে দিয়েছেন। এমনকি তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনও হারাম করে দিয়েছেন। (সূরা তাওবা: ৩১; সূরা মায়েদা: ৫১; সূরা বাকারা: ২২১)

পাঠক! এই হল বর্তমান খ্রিস্টধর্মের স্বরূপ। যা মূলত খ্রিস্টবাদ নয়; বরং সেন্ট পলবাদ এবং যার ধর্মগ্রন্থ প্রকৃত তাওরাত বা ইঞ্জিল নয়; বরং সেন্ট পলের কিছু চিঠি আর অজ্ঞাতনামা কিছু ব্যক্তির রচনা। উপরন্তু যদি এ ধর্ম এবং তার ধর্মগ্রন্থ অবিকৃতও থাকত, তবু তা অনুসরণযোগ্য ছিল না। কেননা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর পূর্বের সকল ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। শেষ নবীর আগমনের পর পরকালীন মুক্তির একমাত্র উপায় হল, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা। এর বিপরীতে ইয়াহুদী খ্রিস্টান বা মানব রচিত অন্য কোন ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থ অনুসরণ করা অথবা পরকালীন মুক্তির উপায় মনে করা স্পষ্ট কুফরী এবং জাহান্নামী হওয়ার পথ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট (গ্রহণযোগ্য) দীন কেবল ইসলামই। (সূরা আলে ইমরান; ১৯)

আরও ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন অবলম্বন করতে চাইবে তার থেকে সে দীন কবুল করা হবে না। এবং আখেরাতে সে মহা-ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা আলে ইমরান; ৮৫)

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সীরাতে মুস্তাকীমের পথে অটল রাখুন। আমীন।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

লেখক : বিভাগীয় প্রধান, উলূমুল হাদীস বিভাগ, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

পানি নয়! মরীচিকা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً... **অর্থ : এবং যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের** কার্যাবলী যেন মরুভূমির মরীচিকা, যাকে পিপাসার্ত লোক মনে করে পানি। অবশেষে যখন সে তার কাছে পৌঁছে তখন বুঝতে পারে, তা কিছুই নয়...। (সূরা নূর- ৩৯)

দৃষ্টান্তটি মূলতঃ কাফিরদের জন্য। আফসোসের বিষয়! আজ অনেক মুসলমানও ক্ষণস্থায়ী জীবনে শান্তির আশায় শরীয়ত বিরোধী ও শরঈ দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় পথ ও পন্থা অবলম্বন করে। অবশেষে তাদের আশা মরুভূমির মরীচিকা হয়ে প্রকাশ পায়। তখন হতাশা ছাড়া প্রাপ্তি আর কিছুই থাকে না। এ কলামে এমনই কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হবে। এসব চিত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠবে আলোচ্য আয়াতের যথার্থতা। উদ্দেশ্য হল, বিবেকবানেরা যেন সময় থাকতে সতর্ক হয়। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দিন। আমীন॥

সুখী পরিবারের সুখ সমাচার-১৪

ডিসেম্বর ২০১৬ এর শেষ দিকে কানাডা প্রবাসী এক অপরিচিত বোন পর-পর কয়েকদিন দীর্ঘ ফোনালাপে তার পারিবারিক জীবনের দুখিয়ারি শোনালেন। আলাপের দীর্ঘতা ছিল আমার জন্য খুবই ক্লান্তিকর। কিন্তু তিনি বারংবার দাবী করছিলেন যে, তিনি খুব সংক্ষিপ্তাকারে বলছেন। ভদ্র মহিলা জন্মসূত্রে ঢাকার বাসিন্দা। ঢাকায় নিজস্ব বাড়ি । জেনারেল শিক্ষিতা।

বিসিএস ক্যাডার। দেশে সরকারি চাকরী করতেন। চাকরী জীবনেই বিবাহ হয় জেনারেল শিক্ষিত একলোকের সঙ্গে। লোকটি অসৎসঙ্গে পড়ে গিয়েছিল। মাঝেমধ্যে নেশাদ্রব্য গ্রহণ করতো। অসৎসঙ্গের কুপ্রভাব থেকে স্বামীকে রক্ষা করার জন্য ভদ্র মহিলা আমেরিকায় চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন। অতঃপর সরকারি চাকরী ছেড়ে প্রথমে নিজে, পরে স্বামীসহ আমেরিকায় প্রবাস জীবন শুরু করেন। সেখানেও স্বামীটি তেমন কর্মমুখী না হয়ে কর্মবিমুখ আড্ডাবাজির প্রতিই বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে। বিভিন্ন পার্টিতে গান গায়। সুযোগ পেলে গাঁজা খায়। আয়-রোজগারে টুকটাক। সংসার নিয়ে ভাবনা নেই, যেহেতু স্ত্রী চাকরী করে। স্ত্রী স্বাবলম্বী কিন্তু স্বামী পরগাছা; স্ত্রী-অবলম্বী। তারপরও স্বামী বলে কথা! যখন তখন স্ত্রীকে মারধর, চড়-থাপ্পড় আর অকথ্য গালিগালাজ। এরই মধ্যে তাদের দু'টি সন্তান। বড়টি ছেলে, অপরটি মেয়ে। ভদ্র মহিলা সেখানে চাকরীর পাশাপাশি মাস্টার্স কমপ্লিট করেন এবং সেখানকার সরকারী চাকরী পেয়ে যান। বিদেশ বিভুঁইয়ে স্বামীকে বোঝানোর মত আপন কেউ নেই। কাজেই স্বামীর ভাই-বোনদেরকেও নিজে স্পন্সর হয়ে আমেরিকায় নিয়ে যান। তারা সকলেই ভালো। ভাইকে বোঝানোর ক্ষেত্রে তারা কোন কমতি রাখেননি। কিন্তু স্বামীর কোন পরিবর্তন নেই। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন পুলিশে ফোন করলে তারা এসে স্বামীকে ধরে নিয়ে যায়। কিছুদিন পর তার ভাই-বোনদের অনুরোধে স্ত্রী নিজে জামিন হয়ে স্বামীকে ছাড়িয়ে আনেন। ভাবলেন, কয়েদী জীবনে স্ত্রীর অনুপস্থিতির অনুভূতি তাকে স্ত্রীর প্রতি সদাচারী হতে সাহায্য করবে। কিন্তু এ ভাবনা ধারণার চেয়েও অধিক ভুল প্রমাণিত হল। এদিকে স্ত্রী ফাঁকে ফাঁকে দীনী বইপত্র পড়ে। দীন-ধর্মের প্রতি মনোযোগী হতে থাকে। ছেলে-মেয়েদেরকে নিয়ে মসজিদে যায়। নিজে বোরকা পরে, হিজাব পরে। নিজেদের মতো করে তা'লীম করে। স্বামী এগুলোর কিছুই পছন্দ করে না। বরং ধর্মকর্ম প্রসঙ্গ আসলেই সেগুলো নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। এমন এমন কথাও মাঝেমধ্যে বলে যার ফলে স্ত্রীর বার বার সন্দেহ হয় যে, ভদ্রলোক মনে হয় ঈমানের বাউন্ডারী অতিক্রম করে গেছেন।

মায়ের প্রতি এহেন অত্যাচার ও অসদাচরণ দেখতে দেখতে সন্তানেরা বাবার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। নিত্যদিনের এ ঝগড়া-বিবাদ তাদের কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে ছেলেটা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রথমে অল্প অল্প পরে পুরোপুরি মানসিক রোগী। লেখাপড়া বন্ধ এবং শয্যাশায়ী। বাধ্য হয়ে মা তাকে মেন্টাল হাসপাতালে ভর্তি করায়। ছেলের সেবাযত্নের স্বার্থে তাকে চাকরিও ছাড়তে হয়।

এগারো মাস ডিউটি বিহীন বেতন চালু ছিল। অতঃপর বেতন বন্ধ হয়ে গেলে চরম অর্থসংকটে পড়েন। এ দীর্ঘ সময়ে বাবা সন্তানের কোন খোঁজ-খবর নেয়নি। স্ত্রীর বেকারত্বের কারণে স্বামীটি যখন সংসারের চাকা বন্ধ হওয়ার উপক্রম দেখল তখন সে তার ভাই-বোনদের বাসায় গিয়ে থাকতে লাগল। ছেলের চিকিৎসার কাজে যাতায়াতের সুবাদে কিছু ডাক্তারের সঙ্গে ভদ্র মহিলার সুসম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তারা অসুস্থ ছেলের চিকিৎসা ব্যয়ে রাষ্ট্রের কাছে সাহায্যের আবেদন জানাতে পরামর্শ দিল । সে অনুযায়ী তিনি আবেদন করেছেন এবং তার জন্য নিয়মিত একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অনুদান মঞ্জুর হয়েছে। এর দ্বারা তার চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের পর কিছুটা সাংসারিক খরচও মিটে। বাবা এ অনুদানের সংবাদ শুনে ফের সংসারে ফিরে আসার পাঁয়তার শুরু করে। অবেশেষে আট মাসের মাথায় অনেক দেন-দরবার করে ফিরেও আসে। বলাবাহুল্য সে নিজের সঙ্গে পূর্বচরিত্রকেও বগলদাবা করে নিয়ে আসে। অল্পদিনের মধ্যেই সন্তানের জন্য বরাদ্দ সরকারি অনুদান উত্তোলনের বাবা হিসেবে সে-ই যে অধিক 'হকদার' এ নিয়ে বচসা শুরু হয়। অবস্থাদৃষ্টে পুত্রের মানসিক সমস্যার পুনঃঅবনতি শুরু হলে ডাক্তারগণ পরামর্শ দিলেন ছেলেকে নিয়ে অন্য কোথাও শিফট হতে, নচেৎ এ রোগী ভালো হবে না। ভদ্র মহিলা মনে মনে কানাডা চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। অনলাইনে কানাডার এক কোম্পানীতে চাকরীর আবেদন করে তাতে ইতিবাচক সাড়া পেয়ে সন্তান দু'টিকে সঙ্গে নিয়ে কানাডায় চলে আসেন। প্রথমে ভাড়া বাসায় উঠে চাকরিতে যোগ দেন। বর্তমানে এখানে খুব ভালো বেতনে চাকরী করছেন। ব্যাংকের সহায়তায় একটি বাড়ি ক্রয় করে নিজ বাড়িতেই থাকেন। ছেলেটা খুব ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছে। মেয়েটা কলেজে পড়ছে। সপ্তাহান্তে ছুটির দিন মহিলা তার স্বামীর কাছে যান। রান্না-বান্না করে দিয়ে আসেন। একটা দিন স্বামীর কাছেই থাকেন। যাওয়া-আসার পথে আড়াই ঘণ্টা করে সময় লাগে। নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করেন। স্বামীকে এখন আগের চেয়ে শান্ত মনে হয়। মাঝে মধ্যে নিজের কাছে কানাডা নিয়ে আসতে মন চায়। স্বামীও খুব আগ্রহ দেখাচ্ছে। কিন্তু অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাকে বারণ করছে। মেয়েটাও বাবাকে কানাডায় নিয়ে আসার ঘোর বিরোধী। মেয়ের কথা হল, বাবা বাসায় আসলে সে-ও ভাইয়ের মতো পাগল হয়ে যাবে। কাজেই কোনক্রমেই তাকে কানাডায় আসতে দেয়া যাবে না। বাবা বাসায় আসলে সে বাসা ছেড়ে হোস্টেলে চলে যাবে বলে মাকে নিয়মিত হুমকি দিচ্ছে।

ভদ্র মহিলা পড়েছেন চরম বিপাকে। আমার সঙ্গে তার যোগাযোগের উদ্দেশ্য মূলত এ সমস্যার শরঈ সমাধান জানতে চাওয়া। তার প্রশ্ন হল, এ অবস্থায় স্বামী থেকে দূরে থাকা বা তাকে দূরে রাখা জায়েয হচ্ছে কি না? স্ত্রী থেকে দূরে থাকায় স্বামী যদি চারিত্রিক অবক্ষয়ের শিকার হয় সেজন্যে স্ত্রী দায়ী হবে কি না? এ বিষয়ে সন্দেহের বেশ কিছু ক্লুও তার হাতে আছে। এদিকে এটাও ঠিক যে, স্বামী তার স্বভাব পাল্টাবে না। এখন সংসারে ফিরে আসা আর স্ত্রীর উপার্জনে দাঁত বসানোর উদ্দেশ্যেই সাধু সেজেছে মাত্র। তাকে কোন ক্রমেই বিশ্বাস করা যায় না। আর সে যদি তার স্বভাব নিয়েই ফিরে আসে তাহলে মেয়েটার পাগল হওয়া মোটামুটি নিশ্চিত আর ছেলেটা হয়তো মারাই যাবে। সেই সঙ্গে ভদ্রমহিলা নিজেও। আমি বললাম, এ অবস্থায় তাকে কানাডায় আসতে দেয়া আপনার জন্য জরুরী নয়। কারণ নিজের ঈমান-আমল ও জান-মালের হুমকির মধ্যে স্বামীর সংসার করা শরীয়তে বাধ্যতামূলক নয়। আপনি ইচ্ছা করলে তার সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্কও ছিন্ন করতে পারেন। এ পর্যায়ে মহিলা আবেগঘন কণ্ঠে বললেন, দাম্পত্য সূত্রটা ছিন্ন করতে চাচ্ছি না। কিন্তু এ দাম্পত্যে ইহকালে আমি এক যন্ত্রণাময় দুঃসহ জীবন ছাড়া আর কিইবা পেলাম তা-ও খুঁজে পাচ্ছি না। সুখের জন্য প্রাচ্য-প্রতীচ্য একাকার করে ফেললাম– এই বুঝি আমার জীবনে সুখ?! ঠিক আছে, ইহকালে সুখের আশা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু এখন পরকালও কি নষ্ট হতে চলেছে? আমেরিকায় থাকাকালে পরিচিত লোকজন ছিল। তাদের সঙ্গে দুঃখ-বেদনার কিছুটা শেয়ার করতাম। আমরা তা'লীম করতাম। এখানে এসে সারাটা সময় অসুস্থ ছেলের সেবা আর চাকরী। ছুটির দিনে যাই স্বামীর কাছে আমেরিকায়। একটু দম নেয়ারই ফুরসত মেলে না, ধর্মকর্ম করবো কীভাবে?

তাকে বললাম, দুনিয়ার জীবনে যাকে আমরা শান্তি মনে করি তা কিন্তু আসল শান্তি নয়। বুযুর্গানে দীন দুনিয়ার শান্তিকে তুলনা করেছেন ছায়ার সঙ্গে। যে ব্যক্তি ছায়ার উল্টো দিকে চলে, ছায়া তার অনুগামী হয়। আর যে ছায়ার দিকে চলতে যায়, ছায়া তার থেকে দূরে সরে যেতে চায়। সে যত দ্রুত গতিতে ছায়া ধরতে যাবে, ছায়াও তত দ্রুত গতিতে তার থেকে দূরে সরে যাবে। অনুরূপ ইহকালে যে ব্যক্তি শান্তির পেছনে ছোটে, সে শান্তি হারায়। আর যে শান্তি থেকে পালাতে চায়, শান্তিই তার অনুগামী হয়। এ সত্যটি বোঝা সম্ভব, বোঝানো সম্ভব নয়।

তাকে আরও বললাম, আগে আমাদের দেশে বেদে সম্প্রদায়ের স্বামীরা স্ত্রীদের কামাই খেতো। সম্ভবত এখনও খায়। তো বেদেগিন্নি বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী মাথায় নিয়ে কোমরে কাপড় পেঁচিয়ে গ্রামের পর গ্রাম চষে বেড়াতো। টুকিটাকি বিক্রি করতো আর মানুষের দূষিত অঙ্গে শিঙ্গা লাগিয়ে এবং রুগ্ন চোখ ও দাঁত থেকে পোকা(?) খুলে পয়সা রোজগার করতো। এদিকে বেদেনীর কর্তা বেদে-মিয়া ডিঙি নৌকায় বসে বসে বাচ্চাদের আগলে রাখতো, তাদেরকে নিয়ে খেলাধূলা করতো। তো বর্তমানে আমাদের শিক্ষিত সমাজে এমন 'বেদে সাহেব'দের সংখ্যা মহামারীর মতো বেড়ে চলছে। এরা চাকরীজীবি মেয়েকে বিয়ে করে বা স্ত্রীকে দিয়ে চাকরী করায়। যেন স্বামী হিসেবে সংসারের বোঝা তাকে টানতে না হয় কিংবা অন্তত স্ত্রীর খোরপোষের দায়িত্ব থেকে রেহাই পাওয়া যায়। অথচ ইসলামী শরীয়ত এ জাতীয় লোককে বিবাহযোগ্য পুরুষ হিসেবে গণ্য করে না। কারণ এরা কর্মবিমুখ হবে, কিংবা অপাত্রে পয়সা খরচ করবে, পরকিয়ায় লিপ্ত হবে। অন্যথায় একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করবে এবং চাকরীজীবি বৈধ স্ত্রীর প্রতি নিরাসক্ত থাকবে। এসব পরীক্ষিত ও যৌক্তিক কারণে ইসলাম স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও সংসারের আর্থিক দায়-দায়িত্ব স্বামীকে দিয়েছে; স্ত্রীকে নয়। স্ত্রী নিজ ইজ্জত-আব্রু বিনষ্ট না করে ঘরের নীরব নিষ্কণ্টক পরিবেশে থেকে কিছু আয় করলে সেটা সম্পূর্ণ তার মালিকানা। এতে স্বামী-সন্তান কারো কোন হক নেই। স্ত্রীর নিজস্ব আয় থাকলেও তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীকেই বহন করতে হবে। স্ত্রী নিজ আয় থেকে দান-সদকা করবে, যাকাত দিবে, কুরবানী করবে, হজ্জে যাবে, পরকালের সঞ্চয় বাড়াবে। নিজের অসুখ-বিসুখে প্রয়োজন হলে খরচ করবে। ফ্ল্যাট কেনা, জমি-জমা কেনা, সংসারে খরচ করা স্ত্রীর দায়িত্ব নয়। 'ইকোনমিক এনিমেল' হতে চাইলে সেটা হবে স্বামী; স্ত্রী কিছুতেই নয়। ভরণ-পোষণের সুব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও মহিলাদের চাকরি করা নিজের পায়ে দাঁড়ানো নয়; নিজ পায়ে কুড়াল মারা। ইসলামের এ নীতির যৌক্তিকতা ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে হলে দীনী ইলমের প্রয়োজন। জাগতিক জ্ঞানের মাধ্যমে পারলৌকিক শান্তির রহস্য অনুধাবন করা সম্ভব নয়। যা হোক, ভদ্র মহিলাকে এ জাতীয় কিছু কথা বলার পর তার দুঃস্বপ্নের ঘোর কিছুটা কাটলেও সমাধানের পথ যে প্রায় অসম্ভব তা স্বীকার করে নিল।

ধর্মকর্মের প্রসঙ্গে তাকে বললাম, এক্ষেত্রে মনে হয়, আপনি একাকী চলেছেন কিংবা অন্যদেরকেও নেতৃত্ব দিতে চাচ্ছেন। আপনার মতো মানুষের জন্য এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। দীনের ব্যাপারে একাকী চলে কিংবা সমপর্যায়ের অন্যদের পাল্লায় পড়ে দেশে-প্রবাসে আজ অনেকেই কাদিয়ানী, আগাখানী হয়েও নিজেকে সাচ্চা ধার্মিক মনে করছে। কাজেই কানাডায় আপনি তাবলীগী পরিবারগুলোর সঙ্গে জুড়ে থাকতে চেষ্টা করুন। কারণ, বিশ্বব্যাপী তাবলীগের আমলের পেছনে উলামায়ে কেরামের শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে। দীনী কোন কাজ যতদিন উলামায়ে কেরামের পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য নিয়ে চলবে, সাধারণ মানুষের জন্য তা নিরাপদ ও নিষ্কণ্টক থাকবে। এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র যে কোন উদ্যোগই গোমরাহির গর্তে নিক্ষেপ করবে। এ পর্যন্ত ফোনালাপে অনেক সময় দেয়ার জন্য তিনি শুকরিয়া জানিয়ে পরের দিন আরও কিছু বিষয়ে আলাপ করবেন জানিয়ে সেদিনের মতো কথা শেষ করলেন।

পরের দিন তার ফোনালাপের বিষয় ছিল, তিনি ঢাকার ও কানাডার বাড়ি, নিজের সঞ্চিত অর্থ ও অবসর সুবিধা বা আকস্মিক মৃত্যুজনিত কারণে ক্ষতিপূরণের অর্থ ছেলে ও মেয়ের নামে উইল করে দিতে চান। এর কারণ হিসেবে তিনি বললেন, মানসিক যন্ত্রণায় ভুগে ভুগে আমি বিভিন্ন শারীরিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছি। মনে হয় বেশিদিন আর বাঁচবো না। কানাডার আইন অনুযায়ী স্বামীর পূর্বে স্ত্রী মারা গেলে স্বামী একাই সকল সম্পত্তির মালিক হয়ে যায়, সন্তানেরা কিছুই পায় না। এমনটি হলে আমার অসুস্থ ছেলে ও মেয়েটা কল্পনাতীত দুরবস্থায় পড়বে। এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য 'আমার মৃত্যুর পর আমার সম্পদ সন্তানেরা পাবে'- এ মর্মে দানপত্র করে যেতে চাই।

তৃতীয় দিনের প্রশ্ন ছিল, আগামী হজ্জের মৌসুমে তিনি তার ছেলেকে নিয়ে হজ্জে যেতে চান। তার আশঙ্কা, এক্ষেত্রে স্বামী ভীষণ ক্ষুব্ধ হবে। পক্ষান্তরে স্বামী নিজ খরচে স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জে যাবে না, আর স্ত্রীও নিজ খরচে স্বামীকে সঙ্গে নিতে রাজি নয়। তো স্ত্রীর এমন হজ্জ আল্লাহর দরবারে কবুল হবে কি না?

উভয় প্রসঙ্গে শরীয়তের যে দিকনির্দেশনা আছে তা তাকে জানানোর পর অনেক অনেক শুকরিয়া জানালেন এবং প্রয়োজনে আবারও ফোন করবেন বলে কথা শেষ করলেন।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

লেখক : আবূ তামীম

সুন্নাহ-সম্মত পোশাক

মুফতী শাব্বির আহমাদ

(এক)

আল্লাহ তা'আলার বিধানের প্রতি পূর্ণ সমর্পণ ঈমান ও ইসলামের অপরিহার্য শর্ত। এই আত্মসমর্পন ছাড়া কেউ মুসলমান হতে পারে না। শরীয়তের এ বিধান নারী পুরুষ সকলের জন্যই সমান প্রযোজ্য। ঈমানদার নারী পুরুষ সর্বাবস্থায় শরীয়তের হুকুম-আহকামের অধীন। কুরআনুল কারীমে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে,

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضي الله ورسوله امرًا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضللا مبينا.

অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন পুরুষ কিংবা নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন অধিকার নেই। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করলে সে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হবে। (সূরা আহযাব- ৩৬)

বলা বাহুল্য, ইসলাম কেবল কিছু রীতিনীতি ও ধ্যানধারণার নাম নয়, ইসলাম হল একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান। ইসলাম ভিন্ন অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদের সারকথা হল কিছু বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, কিছু উপাসনা ও কিছু নীতিকথা। কিন্তু ইসলাম মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জীবনের এমন কোন অঙ্গন নেই, যে ক্ষেত্রে শরঈ নীতিমালা নেই। একজন মানুষ পূর্ণ মুসলিম হিসেবে তখনই স্বীকৃতি পাবে যখন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শরীয়তের পাবন্দ হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. انه لكم عدو مبين.

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ, তোমরা পূর্ণাঙ্গ ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করোনা, নিশ্চই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা বাকারা- ২০৮)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা একথাই বলেছেন যে, এমন যেন না হয়; তোমরা ইসলামের কিছু বিষয় মেনে নিলে আর কিছু মানলে না কিংবা তা মানতে গিয়ে গড়িমসি করলে। এমন করা হলে তা ইসলাম হবে না। বরং তা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা হবে। বস্তুত কুরআন সুন্নাহয় বর্ণিত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের নামই হচ্ছে ইসলাম। চাই তা বিশ্বাস ও ইবাদতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হোক বা সামাজিক আচার আচরণ, রীতি-নীতি, কিংবা জীবনের অন্য কোন বিষয় সংক্রান্ত হোক। উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফতি মুহাম্মাদ শফী রহ. লিখেছেন,

اس میں ان لوگوں کے لئے بڑی تنبیہ ہے جنہوں نے اسلام کو صرف مسجد اور عبادات کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے، معاملات اور معاشرت کے احکام کو گویا دین کا جز ہی نہیں سمجھتے، اصطلاحی دینداروں میں یہ غفلت عام ہے، حقوق معاملات اور خصوصاً حقوق معاشرت سے بالکل بیگانہ ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان احکام کو وہ اسلام کے احکام ہی یقین نہیں کرتے، نہ ان کے معلوم کرنے یا سیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، نہ ان پر غور کرنے کا۔ نعوذ باللہ۔

অর্থাৎ এ আয়াতে ঐ সকল লোকদের জন্য কড়া সতর্কবাণী রয়েছে যারা ইসলামকে শুধু মসজিদ বা ইবাদতের মাঝে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। লেনদেন ও সামাজিকতার বিধানাবলিকে যারা দীনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করে না। সমাজে পরিচিত দীনদারদের মাঝে এ ত্রুটি ব্যাপকহারে বিদ্যমান। শরীয়তের দৃষ্টিতে অপরের হক, অধিকার, লেন-দেন ও সামাজিক রীতি-নীতি রুচি-প্রকৃতির ব্যাপারে এরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মনে হয়; তারা এসব ব্যাপারে ইসলামের বিধি-বিধান আছে বলেই বিশ্বাস করে না। তাই এগুলো জানতে শিখতে যেমন তাদের কোন আগ্রহ নেই, তেমনি এসবের অনুশীলনেও তাদের কোন আগ্রহ নেই। নাউযুবিল্লাহ। (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন ১/৪৯৯)

(দুই)

পোশাক-পরিচ্ছদ মানবজীবনের অপরিহার্য বস্তু। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এসব ব্যাপারেও রয়েছে শরীয়তের নীতিমালা, রয়েছে ইসলামের সুমহান দিকনির্দেশনা। হাদীসের কিতাবের পাঠকগণ সম্যক অবগত আছেন যে, হাদীসের সব কিতাবেই লেবাস-পোশাক সংক্রান্ত আলাদা অধ্যায় রয়েছে। রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন শিরোনাম। বর্ণিত হয়েছে শত শত হাদীস। একটি তথ্যের মাধ্যমে বিষয়টির গুরুত্ব অনুমান করা যাবে। আল্লামা ইবনুল আছীর জাযারী রহ. সংকলিত 'জামিউল উসূল' কিতাবে লেবাস অধ্যায়ে যে হাদীসগুলো সংকলিত হয়েছে, তার সংখ্যা এক হাজার একশত চব্বিশটি, আল্লামা হাইসামী কর্তৃক 'মাজমাউয যাওয়াইদ' কিতাবে সংকলিত হয়েছে আরো চার শতাধিক হাদীস। কেবল সহীহ বুখারীতেই লেবাস অধ্যায়ে একশত তিনটি শিরোণামে দুইশত বাইশটি মারফূ হাদীস এবং সাহাবা তাবেয়ীদের উনিশটি আসার বিদ্যমান রয়েছে।

আলেমগণ জানেন, উল্লিখিত কিতাবসমূহে যে সকল হাদীস সংকলন করা হয়েছে, তার বাইরেও অনেক হাদীসের কিতাব আছে এবং সেসব কিতাবেও লেবাস-পোশাক সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। এ থেকে খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত গুরুত্বের সাথে লেবাস-পোশাক সংক্রান্ত বিধিবিধান বর্ণনা করেছেন।

এসব হাদীসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লেবাস-পোশাকের ক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুম আহকাম বর্ণনা করেছেন। বুঝিয়ে দিয়েছেন পোশাকের ক্ষেত্রেও একজন ঈমানদার ব্যক্তির থাকবে স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র্য বোধ। পোশাকের মাঝেও ফুটে উঠবে তার ঈমানী ভাবধারা, দীনী ও ইসলামী মূল্যবোধ। কেননা, লেবাস-পোশাক তো সুস্থ রুচিরও পরিচায়ক। এ কারণেই সাহাবা তাবেয়ী যুগের এ সংক্রান্ত বহু ঘটনা হাদীসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

(তিন)

আল্লাহ তা'আলার বিধানের বিপরীতে অন্যকারো আনুগত্য– চাই তা ব্যক্তি বিশেষের হোক বা শ্রেণী বিশেষের কিংবা কোন জাতি বিশেষের– কোন অবস্থাতেই তা গ্রহণযোগ্য নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لا طاعة لبشر في معصية الله انما الطاعة في معروف.

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীর ক্ষেত্রে কারো আনুগত্য বৈধ নয়, মানুষের আনুগত্য কেবল শরীয়ত সম্মত বিষয়েই হতে পারে।[১]

---

১. সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৮৪০ , সহীহ বুখারী; হা.নং ৭১৪৫, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ২৬২৫, সুনানে নাসায়ী; হা.নং ৪২০৫, সহীহ ইবনে হিব্বান; হা.নং ৪৫৬৭, মুসান্নাফে ইবনে আবী

পোশাকের ক্ষেত্রেও হাদীসের এ বাণী শতভাগ প্রযোজ্য। এক্ষেত্রেও কোন বিজাতীয় বেশভূষার অনুসরণ চলবে না। চলবে না কোন বিধর্মী ব্যক্তির সাদৃশ্যগ্রহণ। কোন পাপী-খোদাদ্রোহী ব্যক্তির অনুকরণ হতে পারবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, من تشبه بقوم فهو منهم অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে।[২]

লেবাস-পোশাক মানুষের শি'আর তথা পরিচয় চিহ্নও বটে। এর মাধ্যমে তার সামাজিকতা, জাতীয়তা ফুটে উঠে। বিভিন্ন বাহিনীর ইউনিফর্মের যৌক্তিকতা এখানেই। তাই শরীয়তের রুচি প্রকৃতি অনুযায়ী লেবাস পোশাক পরার অর্থ হল ইসলামের পরিচয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। আর তা লঙ্ঘন করার অর্থ হল ইসলাম বিরোধী শিআর-কালচার সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও পোশাকে বিজাতীয় কালচার বর্জন করা জরুরী। তাছাড়া অন্য অনেক বিষয় থেকে লেবাস পোশাকের বিষয়টি এজন্যও অধিক গুরুত্বপূর্ণ যে, তা একটি প্রকাশ্য বিষয়। এ বিষয়ে শরীয়তের আহকাম লঙ্ঘিত হওয়ার অর্থ হল গর্হিত কাজ প্রকাশ্যে হওয়া। আর কোন গুনাহ প্রকাশ্যে হওয়া অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, كل امتي معافى إلا المجاهرين অর্থাৎ আমার সকল উম্মত ক্ষমার যোগ্য তবে যারা প্রকাশ্যে গুনাহ করে। এর অর্থ হল তওবার মাধ্যমে আল্লাহর মেহেরবানীতে উম্মত সকল গুনাহ থেকে মাফ পেয়ে যাবে, তবে যদি সে প্রকাশ্যে গুনাহ করে এবং লজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে দম্ভ করে চলতে থাকে তাহলে সে মাফ পাবে না।[৩]

শাইবা; হা.নং ৩৩৭০৬, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৬২২, মুস্‌তাদরাকে হাকেম; হা.নং ৪৬২২, হাকেম রহ. হাদীসটিকে সহীহুল ইসনাদ বলেছেন।

২. সুনানে আবূ দাউদ; [লেবাস অধ্যায়] হা.নং ৪০৩১, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ৪০৩১, শু'আবুল ঈমান লিলবাইহাকী; হা.নং ৪০৩১, মুসনাদে বায্‌যার; হা.নং ৪০৩১, তাবারানী আওসাত; হা.নং ৪০৩১, হাইসামী রহ. বলেন, فيه على بن غراب وقد وثقه غير واحد وضعفه بعضهم وبقية رجاله ثقات মাজমাউয যাওয়ায়েদ; হা.নং ৪০৩১।

৩. সহীহ বুখারী; [কিতাবু আদাবিল হাদীস] হা.নং ৫৭২১, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৯৯০।

(চার)

বর্তমানে আমাদের সমাজে দীনের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ইসলামী পোশাক-পরিচ্ছদের বিষয়টিও চরম অবহেলার শিকার। আমরা শরীয়তের দিক-নির্দেশনাগুলো বেমালুম ভুলে যাচ্ছি। পোশাক পরিচ্ছদে বিজাতীয় সংস্কৃতির সয়লাব বয়ে যাচ্ছে। তাদের আবিষ্কৃত নিত্য-নতুন ফ্যাশন আধুনিকতার নামে আমরা গলাধঃকরণ করছি। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই এতে আক্রান্ত হয়ে গেছে। শিশু থেকে শুরু করে সকলের পোশাকের মাঝেই এ প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। অনেকের মাঝে আবার এ সম্পর্কে অজ্ঞতাও চরম পর্যায়ে রয়েছে। কারো কারো এই ধারনাই নেই যে পোশাকের ব্যাপারেও শরীয়তের দিক নির্দেশনা রয়েছে। বিষয়টিকে তারা পুরাপুরি নিজ ইচ্ছা ও স্বাধীনতার বিষয় মনে করে।

কেউ কেউ বলে থাকেন, পোশাকের বিষয়টি কেবল পরিবেশ ও সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এক্ষেত্রে ইসলামী পোশাক বা ইসলামী ভাবধারা বলতে কিছু নেই। এ ব্যাপারে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন। যেকোন পোশাক পরিধান মানুষের নিজস্ব অধিকার। এক্ষেত্রে ইসলামকে টেনে আনা উচিত নয়। এটা সঙ্কীর্ণতার পরিচয়। কেউ আবার বলে থাকেন, ধর্মের সম্পর্ক অন্তরের সঙ্গে, শরীরের সঙ্গে নয়। বাহ্যিক পোশাক নিয়ে ধর্মের কোন মাথা-ব্যাথা নেই। পোশাক-আশাক নিয়ে বাড়াবাড়ি করা মোল্লা-মৌলভিদের কাজ, এরা নিজেদের মত করে ধর্মের প্রচলন চায়, নিজেদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন শর্ত জুড়ে দিয়েছে, বাস্তবে ধর্মতো সহজ বিষয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত সব শর্ত আরোপ করেননি। মোল্লা-মৌলভীদের নিজস্ব সঙ্কীর্ণতার কারণে তারা আজ ধর্মকে এত কঠিন করে ফেলেছে, এগুলো অনভিপ্রেত।

কেউ কেউ আবার একথাও বলে, আমাদের লেবাস পোশাক ইসলামী ভাবধারার না হলে কি হবে, আমাদের অন্তর তো ঠিক আছে, নিয়ত পরিষ্কার আছে। আর যার অন্তর সাফ তার বাহ্যিক দিক ঠিক না থাকলেও কিছু আসে যায় না। ইসলাম মানুষের অন্তর দেখে। অন্তর ঠিক থাকলে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক থাকে। মন ভালো হওয়াই যথেষ্ট। মন ভালো না হলে টুপি, দাঁড়ি, জুব্বা, পাগড়ি পরেও কোন লাভ নেই। কত ইসলামী পোশাকধারীদের দেখি কত ধরনের অন্যায় করে থাকে। এরা কি ইসলামী পোশাকের কারণে ভালো হয়ে গেলো?

মূলত যারা পোশাক ও সাজসজ্জার বিষয়ে নিজেদের মন মতো চলতে চায় বা বিজাতীয় সংস্কৃতি ও ফ্যাশনের অনুকরণ করতে চায়, এরা নিজেদের দুর্বলতা ঢাকতে এসব কথা বলে থাকে। এরা যখন যে ফ্যাশন বের হয়, তখন নির্বিচারে তা আধুনিকতার নামে গ্রহণ করে থাকে। অমুসলিম ও ফাসেকদের রীতিনীতি কিছুই তারা তোয়াক্কা করে না। ইসলাম তো ভিতর বাহির দুটোরই ধর্ম। দু'টিকেই ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وذروا ظاهر الاثم وباطنه অর্থাৎ তোমরা প্রকাশ্য গুনাহ ছাড় এবং অভ্যন্তরীন গুনাহ ছাড়। (সূরা আনআম- ১২০)

শরীয়তের বিধিবিধান তো ভিতর বাহির উভয় ক্ষেত্রেই রয়েছে। অন্তর যেমনি সাফ হতে হবে, বাহ্যিক অবয়বও তেমনি পরিশুদ্ধ হতে হবে। পোশাক-আশাকও তেমনি রুচিপূর্ণ হতে হবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে উভয়টি কাম্য। পোশাক পরিচ্ছদ বাহ্যিক বিষয় বটে, মানুষের সকল ভালো-মন্দের দলীল এটা নয়। কিন্তু এ কথাতো অনস্বীকার্য যে, মানুষের স্বভাব-চরিত্রের উপর লেবাস-পোশাকের বিশাল প্রভাব রয়েছে।

বর্তমানে তো মনোবিজ্ঞানীরাও একথা অকপটে স্বীকার করে নিয়েছে যে, মানুষের পোশাক তার স্বভাব চরিত্রের উপর প্রতিক্রিয়াশীল। মানুষের বাস্তব জীবন ও চিন্তাধারার প্রতিফলন পোশাকের মাঝে ফুটে উঠে। এটা কি অস্বীকার করা যাবে যে, কিছু পোশাক অন্তরে অহঙ্কার-আত্মগরিমা সৃষ্টি করে। আবার কিছু পোশাক অন্তরে বিনয় ও নম্রভাব জাগ্রত করে, কিছু পোশাক ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করে, অন্যদিকে কিছু পোশাক মন্দ ও অকল্যাণের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

একথাও তো বাস্তব যে অন্তরে অবক্ষয় শুরু হলে বাহ্যিক অবস্থায়ও তার প্রভাব পড়ে। ফলের ভেতর পচন শুরু হলে বাহিরে তার চিহ্ন প্রকাশ পেতে থাকে। এমন লোকেরা কি জাগতিক বিষয়ে বাহ্যিক অবয়বে সুন্দরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না? গাড়ির ইঞ্জিন ভালো হওয়াই কি যথেষ্ট? বডি ফিটনেসের কি প্রয়োজন নেই? বাড়ির প্লাস্টার ও পেইন্টের প্রয়োজনীয়তা কি তারা অস্বীকার করবে? বহিরাংশ পঁচা,

দৃষ্টিনন্দন নয় এমন জাগতিক জিনিসগুলো কি তারা স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করবে? আসলে পার্থিব সকল বিষয়ে কেবল ভেতর ঠিক থাকলেই চলে না; বাহ্য অবস্থাও ভালো হওয়া লাগে। কিন্তু দীন-শরীয়ত ও আখেরাতের বিষয়ে সকল বাহানা। এরাই ঐসব লোক যাদের নিকট কোট-টাই পরা ধর্ম-প্রচারক ভালো লাগে, পাগড়ীধারী উলামায়ে কেরামের মাঝে তারা সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পায়। ইসলামী পোশাককে তারা সাম্প্রদায়িক পোশাক মনে করে, হুযূর-মাওলানাদের ইউনিফর্ম বলে তাচ্ছিল্য করে থাকে, কখনো আবার সৌদি, পাকিস্তানি পোশাক বলে গালমন্দ করে।

ইসলামী পোশাক মানে কোন সাম্প্রদায়িক বা আঞ্চলিক পোশাক নয়, তবে হ্যাঁ, মুসলিম জাতির পোশাক, চাই সে যে অঞ্চলের অধিবাসী হোক।

অবশ্য এমন লোক আছে যারা এ কারণে ইসলামী লেবাস পরে না যে তা পরে কোন অন্যায় অপরাধ করলে ইসলামী লেবাসের অপমান হবে। কিন্তু কথা হল; যদি তা শরীয়তের দৃষ্টিতে কাম্য হয়, তাহলে এ ভয়ে অপরাধ ছাড়তে হবে, ইসলাম তো ছাড়া যাবে না।

কেউ কি মুসলমান অবস্থায় অন্যায় করলে ইসলামের বদনাম হবে? এভয়ে ইসলাম ছেড়ে দিবে? মূলত এগুলো শয়তানের ধোঁকা বৈ কিছু নয়। তবে আমাদের দেশে এ প্রবণতাও রয়েছে যে, ইসলামী লেবাসধারী লোক অন্যায় করলে দোষ ব্যক্তির উপর না পড়ে পোশাকের দিকে আসতে থাকে। দোষকে ছুতো বানিয়ে পোশাককে গালমন্দ করতে থাকে। কেউ দোষ করলে অবশ্যই তা দোষ কিন্তু একে ছুতো বানিয়ে তার গুণটাকে অস্বীকার করা বা গুণটাকে গালমন্দ করা তো বিবেকবান মানুষের কাজ হতে পারে না।

(পাঁচ)

ইসলাম বাস্তবতার ধর্ম। ইসলামের শিক্ষা বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন। এতে মানবীয় স্বভাবজাত চাহিদার অপূর্ব প্রতিফলন রয়েছে। উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই ইসলাম পোশাক আশাকের মূল্যায়ন করেছে। স্থান, কাল, মৌসুমের ভিন্নতার কারনে পোশাকের ভিন্নতার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা হয়নি। মোটা, পাতলা বা কোন বিশেষ ডিজাইনের পোশাক ইসলাম বাধ্যতামূলক করে দেয়নি, যে তাছাড়া অন্য ধরন বা কালার ব্যবহার করা যাবে না বা তা করলে ইসলাম পরিপন্থি হবে। তবে ভারসাম্যপূর্ণ রুচিসম্মত এক নীতিমালা শিক্ষা দিয়েছে। যে মূলনীতিগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা সর্বাবস্থায় জরুরী। এ মূলনীতিগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে যেকোন ধরনের পোশাক ব্যবহার করা যাবে। আমরা প্রথমে সে মূলনীতিগুলো সম্পর্কে আলোচনা করবো।

প্রথম মূলনীতি : সতর আবৃত করা।

পোশাক এমন হতে হবে, যা পুরোপুরি সতর আবৃত করে। পুরুষের সতর হল নাভি থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত আর মহিলাদের জন্য পরপুরুষ ও অমাহরাম আত্মীয়দের ক্ষেত্রে পুরো শরীর সতরের অন্তর্ভুক্ত। পোশাকের প্রধান উদ্দেশ্যই হলো সতর ঢাকা। (সূরা আহযাব- ৫৯, আহকামুল কুরআন [থানবী রহ.] ৩/৪১৬, মাজমূ‘আ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ২২/১১১, মউসূআতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ৪০/৩৪৩, তাফসীরে কুরতুবী ১৪/২২৭)

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ অর্থাৎ হে বনী আদম, আমি তোমাদের জন্য অবতীর্ণ করেছি পোশাক, যা তোমাদের গুপ্তাঙ্গগুলোকে আবৃত করে এবং সৌন্দর্য দান করে। তাকওয়া-পরহেজগারীর পোশাক তোমাদের জন্য সর্বোত্তম। (সূরা আ'রাফ- ২৬)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা পোশাকের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাহল সতর আবৃত করা। এখানে سَوْآةِ শব্দের অর্থ হলো এমন স্থান যা খোলা রাখা স্বভাবতই মানুষ লজ্জাজনক মনে করে। সুস্থরুচি এগুলো অপরের সামনে খুলে থাকাকে অপছন্দ করে। বলা বাহুল্য, শরীয়ত নারী পুরুষের সতরের বিবরণ পেশ করে سَوْآةِ এর সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে। অতএব যে পোশাক এ উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হবে, অর্থাৎ যা দ্বারা পূর্ণ সতর আবৃত হয়না, এমন পোশাক শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয পোশাক। এ ধরনের পোশাক শরীয়তের দৃষ্টিতে পোশাকেরই অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব এমন পোশাক পরিত্যাগ করে পূর্ণ সতর আবৃত থাকে এমন পোশাক পরিধান করা আবশ্যক। সূতরাং পুরুষের জন্য হাফপ্যান্ট পরা, মহিলার জন্য সতরের কোন অংশ উন্মুক্ত থাকে এমন পোশাক পরিধান নাজায়েয। মূলত তিন ধরনের পোশাক এ মূলনীতির আলোকে অবৈধ পোশাক সাব্যস্ত হবে।

১। এমন সংক্ষিপ্ত পোশাক যা সতর আবৃত রাখতে ব্যর্থ

২। এমন পাতলা ফিনফিনে পোশাক যা পরিধান করলে বাহ্য দৃষ্টিতে সতর আবৃত হয় বটে, তবে পাতলা হওয়ার কারণে শরীর বুঝা যায়, এমন পোশাক সতর আবৃত না করার কারণে নাজায়েয পোশাক গণ্য হবে।

এমন পোশাক শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয পোশাকের অন্তর্ভুক্ত।

৩। এমন আঁটসাঁট পোশাক যা পরিধান করা সত্ত্বেও সতরের আকৃতি পোশাকের উপর ফুটে ওঠে তাও সতর আবৃত না করার কারনে নাজায়েয পোশাকের অন্তর্ভুক্ত হবে। স্বামী ছাড়া অন্য কারো সম্মুখে এমন পোশাক পরিধান করা হারাম সাব্যস্ত হবে।

অতএব পুরুষের পোশাক এমন হতে হবে যা দ্বারা নাভি থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত আবৃত থাকবে। সতরের কোন অংশ খোলা থাকবে না এবং তা এত আঁটসাঁট হতে পারবে না যে তা দ্বারা স্পর্শকাতর অঙ্গগুলোর অবয়ব ফুটে উঠবে। বরং তা ঢিলেঢালা হতে হবে। অনুরূপ এমন পাতলাও হতে পারবে না যা দ্বারা সতর দেখা যাবে। নারীদের পোশাকের ক্ষেত্রেও এ তিন শর্ত পাওয়া যাওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি কোন পোশাকে এ তিন শর্তের কোন শর্ত অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তা নাজায়েয পোশাক সাব্যস্থ হবে।

সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিমে উল্লিখিত আছে,

فكل لباس ينكشف منه جزء من عورة الرجل والمرأة لا تقره الشريعة الإسلامية مهما كان جميلا أو موافقا لدور الازياء وكذلك اللباس الرقيق أو اللاصق بالجسم الذي يحكي للناظر شكل حصة من الجسم الذي يجب ستره فهو في حكم ما سبق في الحرمة وعدم الجواز .

অর্থাৎ প্রত্যেক ঐ পোশাক যা পরিধান করা সত্ত্বেও নারী-পুরুষের সতরের অংশ-বিশেষ খুলে থাকে তা শরীয়ত অনুমোদন করে না, চাই তা যত চমৎকারই হোকনা কেন বা যত ফ্যাশনেবলই হোকনা কেন। অনুরূপ পাতলা লেবাস বা এমন আঁটসাঁট পোশাক যা দ্বারা দর্শকের সামনে শরীরের এমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকৃতি ফুটে ওঠে যা ঢেকে রাখা আবশ্যক, এমন পোশাক হারাম ও নাজায়েয পোশাকের অন্তর্ভুক্ত। (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ৪/৮৮)

বর্তমান যুগে আধুনিক ফ্যাশনের অন্ধ-অনুকরণের ফলে পোশাকের ক্ষেত্রে নগ্নতার ছড়াছড়ি চলছে। নারীদের পোশাকের ক্ষেত্রে যেন তা মহামারী আকার ধারণ করেছে। উপরোক্ত তিন শর্তের কোন তোয়াক্কাই করা হচ্ছে না। সতর খোলা থাকছে, ফিনফিনে পাতলা পোশাক পরা হচ্ছে, আঁটসাঁট স্কিনটাইট পোশাক পরা হচ্ছে। এসবই শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয পোশাক। এগুলোতে পোশাকের মূল মাকসাদই ব্যাহত হচ্ছে। পোশাক পরা সত্ত্বেও নগ্নতার গোনাহ হচ্ছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا

অর্থাৎ দুই শ্রেণীর লোক জাহান্নামী। এদেরকে আমি দেখিনি দুনিয়ায় তারা পরবর্তীতে আসবে। (এক) এমন লোকজন যাদের সঙ্গে গরুর লেজের মত লাঠি থাকবে। যার দ্বারা তারা মানুষকে অন্যায়ভাবে পিটাবে। (দুই) ঐ সকল নারী যারা কাপড় পরিধান করা সত্ত্বেও বিবস্ত্র থাকে, পর পুরুষকে আকৃষ্ট করে বেড়ায়, নিজেরাও পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট থাকে। তাদের মাথার চুল ঝুঁকে পড়া বুখতী উটের কুঁজের ন্যায় হবে। এরা জান্নাতে যেতে পারবে না। এমনকি এরা জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ বহু দূর থেকে পাওয়া যায়।[৪]

পাশ্চাত্যের অশ্লীল ও খোদাদ্রোহী সংস্কৃতি ও তার অনুসারীদের প্রকৃতি বিরোধী প্রবণতার এটিও একটি মারাত্মক দিক যে, তারা নারীদের যথাসম্ভব অনাবৃত রাখতে উৎসাহ দিয়ে থাকে। আর পুরুষের ক্ষেত্রে পোশাক দিয়ে পুরো শরীর এমনকি টাখনুসহ আবৃত রাখতে চেষ্টা করে। একজন পুরুষ টাখনু অনাবৃত রেখে পাজামা, প্যান্ট পরিধান করলে তাদের দৃষ্টিতে খারাপ দেখায়, স্মার্টনেস ভূলুণ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে একজন মহিলা টাখনুর উপরে প্যান্ট, পাজামা, স্যুট ইত্যাদি পরিধান করলে মোটেও খারাপ দেখায় না বরং ভালো দেখায়, স্মার্টনেস সংরক্ষিত হয়। তাদের দৃষ্টিতে মহিলাদের শরীর অনাবৃত রাখা, আঁটসাঁট বা স্কিনটাইট পরিধান করা নারী স্বাধীনতা।

এজন্যই একজন পুরুষ গরমকালেও পরিপূর্ণ স্মার্ট ও ভদ্রলোক হওয়ার জন্য মাথা থেকে পায়ের পাতার নিম্ন পর্যন্ত পুরো শরীর একাধিক কাপড়ে আবৃত করে রাখে। অপরদিকে শীতকালেও একজন মহিলা মাথা, গলা, কাঁধ, পা, হাঁটু ইত্যাদিসহ যথাসম্ভব দেহ অনাবৃত রাখে। বেহায়া পুরুষদের অশ্লীল দৃষ্টির আনন্দদান ছাড়া এভাবে দেহ অনাবৃত রাখার আর কি উদ্দেশ্য হতে পারে?

দ্বিতীয় মূলনীতি : বিধর্মীদের পোশাক না হওয়া।

আল্লাহ মুসলমানদেরকে স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জাতির মর্যাদা দান করেছেন। মুসলমানদের মর্যাদা আলাদা। আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। ইরশাদ করেছেন, هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দু'ভাগে বিভক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের কেউ কাফের আর কেউ মু'মিন। (সূরা তাগাবুন- ২)

অনুরূপ কোন পোশাক তাদের শিআর বা বিশেষ পোশাক নয় কিন্তু তাদের ব্যবহার্য। এক্ষেত্রে যদি সে পোশাক তাদের অনুসরণের ইচ্ছায় পরিধান করা হয় বা তাদের মতো যেন মানুষ মনে করে এ ইচ্ছায় পরিধান করা হয় তাহলে তা নাজায়েয হবে। এ দু অবস্থাকে শরীয়তের পরিভাষায় تشبه তাশাব্বুহ বলা হয়। হাদীস শরীফে এসেছে, من تشبه بقوم فهو منهم অর্থাৎ কেউ যদি কোন বিজাতীর সাদৃশ্য গ্রহণ করে, তাহলে সে তাদের দলভুক্ত গণ্য হবে। (সুনানে আবূ দাউদ)[৫]

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে (১/৪৩) হযরত উমর রাযি. বলেন, وذروا التنعم وزي العجم অর্থাৎ তোমরা বিলাসিতা ও অমুসলিমদের রীতি, পোশাক পদ্ধতি, ফ্যাশন পরিত্যাগ কর।[৬]

পোশাক-পরিচ্ছদেও পুণ্যবানদের অনুসরণ, অনুকরণ প্রশংসনীয় ও পালনীয়, আর কোন অমুসলিম পাপী ব্যক্তির অনুকরণ নিন্দনীয় ও বর্জনীয়। তাই তাদের কোন বিশেষ পোশাক বা পোশাকের বিশেষ ডিজাইন কোনভাবেই গ্রহণ করা যাবে না। যারা কুফরী সংস্কৃতির কাছে মানসিকভাবে পরাজিত হয়ে গিয়েছে, তাদের নিকট কাফের মুশরিক ও খোদাদ্রোহী পাপীদের স্টাইল চাল-চলন তৃপ্তিদায়ক, সেগুলো তাদের নিকট সুন্দর ও স্মার্ট মনে হয়, আর উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি., আলী ইবনে আবী তালিব রাযি., বিলাল রাযি. এর অনুকরণ তাদের নিকট বাজে, নোংরা, অসুন্দর ও আপত্তিকর মনে হয়। বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও অজুহাত দিয়ে তারা সেগুলোকে বাদ দিতে চায়। তারা একথা ভাবেন না যে, তাদের পোশাক আশাক দেখে আল্লাহ তা'আলা কতটুকু খুশি হবেন, তারা ভাবেন কুফরী সংস্কৃতির ধারকেরা অথবা তাদের মত পরাজিত মানসিকতার লোকেরা তাদেরকে কি বলবে? তারা ভালো বলবে? স্মার্ট বলবে এবং প্রশংসা করবে কি না?

তবে কোন পোশাক যদি বিজাতির বিশেষ পোশাক বা বিশেষ ডিজাইনের অন্তর্ভুক্ত না হয় এবং কোন পাপী সমাজেরও বিশেষ ফ্যাশন না হয়, তাদের মতো দেখা যাওয়ার ইচ্ছাও পোশাক গ্রহণকারীর না হয়, এমনিতেই তাদের মতো হয়ে যায়, দৃশ্যত তাদের মতো হওয়ার কোন ইচ্ছা নেই, ছিল না, তাহলে একে শরীয়তের পরিভাষায় মুশাবাহাত বলে। এটিও পরিহারযোগ্য। এ অনাকাঙ্ক্ষিত মুশাবাহাত বা সাদৃশ্য থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এটি যদিও শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম বা নাজায়েয নয় কিন্তু অবশ্যই অনুত্তম/মাকরূহ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, خالفوا المشركينঅর্থাৎ (লেবাস-পোশাকের ক্ষেত্রেও) মুশরিকদের রুচি বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধাচারণ কর। (সহীহ বুখারী; [লেবাস অধ্যায়] হা.নং ৫৫৫৩, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৫৯)

অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم علي القلانس অর্থাৎ আমাদের এবং মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য টুপির উপর পাগড়ি পরিধান করা। মুশরিকরা পাগড়ির নিচে টুপি পড়ে না, আমরা পড়ে থাকি। (সুনানে আবূ দাউদ; [লেবাস অধ্যায়] হা.নং ৪৪/৮, আস্সুনান লিত্তিরমিযী; হা.নং ১৭৮৪, তাবারানী; হা.নং ৪৬১৪, বাইহাকী; হা.নং ৬২৫৮)

(৪২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

৪. সহীহ মুসলিম; হা.নং ২১২৮, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৮৬৫০, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা; হা.নং ৬৬৯০, সহীহ ইবনে হিব্বান; হা.নং ৭৪৬১।

৫. হাদীসের বিশ্লেষণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. মুসনাদে আহমদ; হা.নং ৩০১, শাইখ শুআইব আল আরনাউত্ব হাফিযাহুল্লাহু তা'আলা হাদীসের সনদ সম্পর্কে বলেন, অর্থাৎ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম রহ. এর শর্তানুসারে সহীহ, বায়হাকী; হা.নং ১৯৫২২, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ২৪৮৬৯।

আধুনিক সাজসজ্জা ও ইসলাম

মাওলানা সাঈদুয্যামান

কুরআনে কারীমের সূরা যুখরুফে আল্লাহ তাআলা মহিলাদেরকে 'অলঙ্কারে প্রতিপালিত' বলে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে কয়েকটি বিষয় অনুধাবন করা যায়।

এক. সাজসজ্জার প্রতি আকর্ষণ মহিলাদের স্বভাবজাত একটি বিষয়।

দুই. সাজসজ্জা অবলম্বন করা তাদের জন্য বৈধ। (বরং দীনী মূলনীতির আলোকে ক্ষেত্রবিশেষে কাম্যও বটে।)

তিন. আয়াতের পূর্বাপর ও বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা বোঝা যায়, বৈধ হলেও সারা দিনমান সাজসজ্জা ও প্রসাধনে ডুবে থাকা সমীচীন নয়। এটা বিবেক-বুদ্ধির দুর্বলতার লক্ষণ।

চার. 'প্রতিপালিত' শব্দ দ্বারা অনুমিত হয়, স্বভাবজাত ও বৈধ হওয়ার কারণে সাজসজ্জা খাতে অভিভাবকের সাধ্য অনুযায়ী কিছু অর্থ ব্যয় করাও মহিলাদের মানবিক অধিকার।

স্বভাবধর্ম ইসলাম মহিলাদের জন্য সাজসজ্জা অবলম্বনের বৈধতা প্রদানের পাশাপাশি সাজসজ্জার পরিমিতি ও তা প্রদর্শনের সীমারেখাও নির্ধারণ করে দিয়েছে।

সাজসজ্জা অবলম্বনের ক্ষেত্রে ইসলাম মহিলাদেরকে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বাড়াবাড়িও দোষনীয়, ছাড়াছাড়িও কাম্য নয়।

মধ্যপন্থাঃ ইসলাম যে ধরনের সাজসজ্জা যার বা যাদের সামনে অবলম্বনের অনুমতি দেয় সেটাই মধ্যপন্থা।

বাড়াবাড়িঃ অননুমোদিত সাজসজ্জা অবলম্বন কিংবা অনুমোদিত সাজসজ্জা লজ্জা-শরম বিসর্জন দিয়ে অননুমোদিত ব্যক্তির সামনে প্রদর্শন করা সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি।

ছাড়াছাড়িঃ কাম্য ক্ষেত্রেও পরিমিত সাজসজ্জা গ্রহণ না করে অপরিপাটি থাকা ছাড়াছাড়ি হিসেবে বিবেচিত।

সাজসজ্জা অবলম্বনের শরঈ দিকনির্দেশনা

১. যাদের সঙ্গে পর্দা করা ফরয তাদের সামনে সাজগোজ প্রদর্শন না করা।

মহিলারা নিজেদের সাজগোজ ও সৌন্দর্য নিজ স্বামী এবং তাদের মাহরাম পুরুষ যথা পিতা, শ্বশুর, নিজ পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাতিজা, ভাগ্নে মোটকথা যাদের সঙ্গে তাদের দেখা দেওয়া বৈধ তারা ব্যতীত অন্য কোন পুরুষ লোকের সামনে প্রকাশ করতে পারবে না।

২.সাজসজ্জা স্বামীর উদ্দেশ্যে হওয়া।

আজকাল মহিলারা স্বামীর মনোতুষ্টির উদ্দেশ্যে সাজগোজ করে না। বাসাবাড়িতে বেশিরভাগ সময় কাজের বুয়ার বেশে থাকে। ছেঁড়াফাটা, পুরনো কাপড়ে নিতান্তই অপরিচ্ছন্ন ও অপরিপাটি হালতে থাকে। জিজ্ঞেস করলে বলে, ঘরের ভেতর আর কে দেখবে, একটা পরলেই হলো, একরকম থাকলেই হলো! অথচ ভালো ভালো আকর্ষণীয় কাপড় ও প্রসাধন সামগ্রীগুলো তুলে রাখে কোথাও যাওয়ার জন্য। স্বল্প সময়ের জন্যও বাইরে বের হলে খুব সেজেগুজে বের হয়। আর কোন অনুষ্ঠানে বা বেড়াতে গেলে তো কথাই নেই, ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাগিয়ে সাজ দেয়। অথচ শরীয়তে এর উল্টোটাই কাম্য। অর্থাৎ নিজ ঘরে স্বামীর সামনে সেজেগুজে পরিপাটি থাকা আর শরঈ ও মানবিক প্রয়োজনে বের হওয়ার দরকার হলে সাধারণ পোশাকে সাজসজ্জা বিহীন বের হওয়া।

৩.অমুসলিমদের অনুকরণ না হওয়া।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের অনুকরণ করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে। সুতরাং এমন সাজুগুজু ও প্রসাধনী যা বিধর্মীদের ধর্মীয় প্রতীক বা নিদর্শনরূপে প্রমাণিত কিংবা তাদের ধর্মীয় ও নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি ইঙ্গিতবাহী, মুসলিম মহিলাদের জন্য তা গ্রহণ করা অবৈধ ও হারাম।

৪.আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট আকৃতি ও কাঠামোকে বিনা প্রয়োজনে বিকৃত না করা।

আল্লাহ তাআলা তার অসীম প্রজ্ঞার ভিত্তিতে প্রতিটি মানুষকে তার উপযোগী আকৃতি ও সৌন্দর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। শরীয়তস্বীকৃত অসুবিধা বা দুর্ঘটনাজনিত শারীরিক বিকৃতির সংশোধন ছাড়া শুধুমাত্র রূপচর্চার মোড়কে তাতে হাত লাগানো ও বিকৃতি সাধন করা হারাম।

সাজসজ্জার ক্ষেত্রে মহিলাদের কিছু বিভ্রান্তি ও বাড়াবাড়ি

এক. প্রসাধন সামগ্রী ক্রয় ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে দ্রব্যটি হালাল, না হারাম এ ব্যাপারে উদাসীন থাকা।

দুই. প্রসাধন সামগ্রী সংগ্রহের ক্ষেত্রে স্বামী বা অভিভাবককে সামর্থ্যের অধিক চাপ প্রয়োগ করা।

তিন. স্বামী বা অভিভাবকের মাধ্যমে সংগ্রহ না করে নিজেরাই মার্কেটে গিয়ে ক্রয় করা। অথচ প্রসাধন সামগ্রী ক্রয়ের উদ্দেশ্যে পর্দা রক্ষা করে হলেও মহিলাদের জন্য ঘরের বাইরে বের হওয়া বৈধ নয়। কারণ প্রসাধন সামগ্রী অতীব প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত নয়।

চার. দীনী ও দুনিয়াবী ব্যক্তিগত জরুরী আসবাব সংগ্রহ না করে অপ্রয়োজনীয় ও ফালতু প্রসাধন সামগ্রী সংগ্রহে অর্থ ব্যয় করা।

পাঁচ. কার কাছে কত দামী ও লেটেস্ট প্রসাধন সামগ্রী আছে এ নিয়ে প্রতিযোগিতায় লেগে যাওয়া এবং গর্ব করা।

ছয়. সংসারের জরুরী কাজ ফেলে রেখে সারাক্ষণ সাজুগুজু নিয়ে পড়ে থাকা। ফলে নামায ইত্যাদি ইবাদত-বন্দেগী ও সাংসারিক দায়িত্বাবলীর প্রতি খেয়াল না থাকা।

সাত. কয়েকজন বান্ধবী বা নিকটাত্মীয়া একত্রিত হয়ে অযথাই সাজগোজ করা এবং একজন অপরজনের ছবি তুলে মোবাইলে সংরক্ষণ করা। এর অনিবার্য ক্ষতি এই যে, পরবর্তীতে এ ছবি অবশ্যই গায়রে মাহরামের দৃষ্টিগোচর হয়।

আট. বিয়ে ইত্যাদি বিভিন্ন উপলক্ষে বিউটি পার্লারে গিয়ে সাজসজ্জা করা টাকা-পয়সাওয়ালা মহিলাদের অন্যতম মারণব্যাধি। পর্দার বিধান লঙ্ঘন এবং ব্যক্তিগত অনিরাপত্তাসহ নানাবিধ পাপাচার ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডের আড্ডাখানা এই বিউটি পার্লার। কয়েক বছর আগে দেশের একটি নামীদামী

বিউটি পার্লারের ভয়াবহ প্রতারণা জাতীয় সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তারা কাস্টমারদের অজান্তেই তাদের স্পা (নগ্ন/অর্ধনগ্ন হয়ে তেল-লোশন ইত্যাদির মাধ্যমে অন্যের হাতে শরীর মর্দন)-এর দৃশ্য গোপন ক্যামেরায় ভিডিও করে এবং পঞ্চাশেরও অধিক স্পা-ভিডিও ফেসবুকে আপলোড করে দেয়। এ-ও শোনা গেছে, বিউটি পার্লারগুলো এসব ভিডিওর মাধ্যমে বহু মেয়েকে ব্ল্যাকমেইল করে অসামাজিক কার্যকলাপে বাধ্য করে। আল্লাহর পানাহ, একজন মানুষের ন্যূনতম হায়া-শরম বাকি থাকলে তার দ্বারা এসব গর্হিত রূপচর্চা কিভাবে সম্ভব। কেউ বলতে পারে, আমরা তো আর স্পা করানোর জন্য পার্লারে যাই না, মেকাপ করা ও চুল বাঁধার জন্য যাই, এতে অসুবিধা কি? জ্বী, অসুবিধা আছে এবং বেশ বড় রকমেই আছে। যে কাজের জন্যই যাওয়া হোক, পেশাদার বিউটিশিয়ানরা দীনী-দুনিয়াবী কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই বিশ্বস্ত নয়। তাদের মাধ্যমে যে কোন প্রকারে ইজ্জত-আব্রু বিনষ্টের প্রামাণ্য হুমকি রয়েছে। তাছাড়া হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী বেপর্দা চলাচলে অভ্যস্ত মহিলারা পরপুরুষের মতো। সে মতে মুসলিম মহিলাদেরকে এ জাতীয় মহিলাদের থেকেও পরপুরুষের মতো পর্দা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এদের হাতে শাড়ি-ব্লাউজ পরা তো দূরের কথা এদের সামনে মুখমণ্ডল খোলারও অনুমতি নেই। কাজেই হিসাব দিবসে যার জবাবদিহিতার বিশ্বাস আছে, সে টুকটাক সাজসজ্জা ঘরে বসেই করে নেবে, কিছুতেই বিউটি পার্লার বা পেশাদার বিউটিশিয়ানের দ্বারস্থ হবে না।

কিছু আধুনিক সাজসজ্জা ও প্রসাধন সামগ্রীর পরিচয় এবং এগুলো ব্যবহারের শরঈ হুকুম

মেকআপ ও রূপচর্চা

১. ওয়্যাক্সিং/ থ্রেডিং (Waxing/ Threading)

[চেহারা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানের লোম উপড়ানো।]

এ পদ্ধতিতে মহিলারা পুরুষের সঙ্গে সাদৃশ্যমূলক পশম যেমন, ঠোঁটের উপরের বা গালের অবাঞ্চিত পশম এবং সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে শরীরের অন্যান্য স্থানের পশম যেমন, হাত- পা ইত্যাদি অঙ্গের পশম উপড়ে ফেলে। পুরুষের সঙ্গে সাদৃশ্যের কারণে স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য ওয়্যাক্সিং বা থ্রেডিং করা জায়েয আছে। কারণ পশম হল পুরুষের সৌন্দর্য আর ক্ষেত্রবিশেষে মহিলাদের জন্য দোষণীয়। তবে লক্ষণীয় হল, এ কাজে এমন কোন উপায় ও উপাদান ব্যবহার করা যাবে না যা, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং যার মধ্যে লাভের চেয়ে ক্ষতির ভাগই বেশি। আর অতিরিক্ত রূপচর্চার জন্য পশম উপড়ানো বিলকুল জায়েয হবে না।

উল্লেখ্য, মহিলাদের জন্য অপর মহিলার সামনে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্থান সতরের অংশ। তাই প্রয়োজন হলে এ অংশের পশম নিজেকেই উপড়াতে হবে। অন্য মহিলাকে দিয়ে উপড়ানো যাবে না। তবে সতর ছাড়া অন্য অংশের ক্ষেত্রে অন্য মহিলার সহায়তা নেয়া যাবে।

২. ভ্রু প্লাক (Eyebrow Plucking)

আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত মানবীয় সৌন্দর্যের অন্যতম হল চোখের ভ্রু। আধুনিক রূপচর্চা জগতে মহিলাদের ভ্রু প্লাক করে বা উপড়ে ফেলে সেখানে পেন্সিল দিয়ে সরু ভ্রু অঙ্কন করা হয়। এতে আল্লাহর সৃষ্টিতে হস্তক্ষেপ ও তার আকৃতি পরিবর্তন করা হয়। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ করেছেন ঐ সমস্ত মহিলাদের প্রতি যারা আল্লাহর সৃষ্টিতে অবৈধ হস্তক্ষেপ করে তা পরিবর্তন করে ফেলে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৯৩৪)

উল্লেখ্য, যদি কোন মহিলার ভ্রু বেশি মোটা ও ঘন হয় এবং সেটা তার স্বামীর অপছন্দের কারণ হয়, তাহলে এমন মহিলার জন্য স্বামীর অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত ভ্রু উপড়ে তা স্বাভাবিক পর্যায়ের করা জায়েয আছে। (ফাতওয়া শামী ৬/৩৭৩, ৪০৭)

৩. মাসকারা (Mascara)

আঠা বা গ্লু জাতীয় জিনিস, যার দ্বারা চোখের পাপড়িগুলো মোটা ও সরু করা হয়। এটা যদিও সাময়িক কিন্তু মনে রাখতে হবে, যেহেতু এটা আঠা জাতীয় জিনিস, যা শুকিয়ে গেলে জমে যায় তাই এটা লাগানো অবস্থায় উযূ করলে উযূ হবে না। হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন, তোমরা ভালো করে উযূ করো। কারণ নবীজী বলেছেন (শুষ্ক) গোড়ালীসমূহ জাহান্নামে ধ্বংস হোক। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৬৫)

৪. আই লাইনার (EyeLiner)

উন্নত মানের আই লাইনার শুকিয়ে গেলে তা প্লাষ্টিক জাতীয় পাতলা ছিলকার মত হয়ে যায়। কাজেই তা না উঠিয়ে উযূ-গোসল করলে তা শুদ্ধ হবে না।

৫. কৃত্রিম পাপড়ি (Fake EyeLashes)

এটা অমুসলিমদের রূপচর্চা; তাই তা পরিহারযোগ্য। তদুপরি কেউ তা লাগালে এ অবস্থায় উযূ-গোসল হবে না।

৬. ব্লাশান (Blushon)

রঙিন পাউডার জাতীয় সাজ-দ্রব্য। এটা ব্যবহার করে মহিলাদের গালের সৌন্দর্য বাড়ানো হয়। এতে পানি লাগলে তা মুছে যায়। তাই তা ব্যবহারে উযূ-গোসলে আপত্তি নেই।

৭. আই শ্যাডো (Eye Shadow)

চুমকি মিশ্রিত রঙিন পাউডার জাতীয় সাজ-দ্রব্য। কখনো পাউডার ও চুমকি আলাদা থাকে। এতে পানি লাগলে তা মুছে গেলেও চুমকি থেকে যায়। ফলে এ অবস্থায় উযূ করলে উযূ হবে না।

৮. নেইল পলিশ (Nail Polish)

শরীয়তের দৃষ্টিতে উযূর অঙ্গসমূহে যদি এমন কিছু লেগে থাকে যার ফলে নিচে পানি পৌঁছে না তাহলে উযূ শুদ্ধ হয় না। যেমন আঠা, স্টিকার, চুইংগাম ইত্যাদি। সন্দেহ নেই যে, নেইল পলিশও এমনই একটি দ্রব্য। তাই নেইল পলিশ লাগানো অবস্থায় উযূ হবে না। উপরন্তু যদি নেইল পলিশ ব্যবহারে অমুসলিম বা ফাসেকদের সাদৃশ্য অবলম্বন উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা নাজায়েয হবে। এখানে আরো একটি খারাপ দিক হল, হিংস্র পশুর ন্যায় লম্বা নখেই নেইল পলিশ যুৎসই হয়ে ফুটে ওঠে। বলাবাহুল্য, এমন পশুসুলভ নখ রাখা ইসলামী শিষ্টাচারের সম্পূর্ণ বিপরীত। নখ ছোট রাখা ইসলামী শরীয়তের স্পষ্ট বিধান। তাই নেইল পলিশ ব্যবহার পরিহারযোগ্য। মুসলিম মহিলাদের জন্য শরীয়তসম্মত সাজ মেহেদিই যথেষ্ট। তারপরও কেউ ব্যবহার করলে উযূ-গোসলের পূর্বে রিমুভার দিয়ে অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে তুলে ফেলতে হবে। নখের কোনায় একবিন্দু পরিমাণ লেগে থাকলেও উযূ-গোসল শুদ্ধ হবে না।

৯. আলগা চুল লাগানো (Wig) এবং চুল কাটা (Hair Cut)

চুল নারীর সৌন্দর্য। তাই সঙ্গত কারণ ছাড়া সেই সৌন্দর্য নষ্ট করা হারাম। উপরন্তু এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে অবৈধ হস্তক্ষেপ হয়। কাজেই এই বিকৃতি নিঃসন্দেহে গুনাহের কারণ হবে।

তবে কোন রোগের কারণে দীনদার অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী যদি চুল কেটে ফেলতে হয় তাহলে অসুবিধা নেই। যেমন, চুলের গোড়া ফেটে যাওয়া বা অপারেশনের প্রয়োজনে কিছু চুল কেটে বা চেছে ফেলা ইত্যাদি। (ফাতাওয়া শামী ৬/৪০৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৫৮)

রইল নকল চুল ব্যবহার করা। এক্ষেত্রেও মানুষ, শুকর, বা হারাম প্রাণীর চুল ব্যতিত অন্য যে কোন ধরনের চুল ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে। তবে শর্ত হল এতে যেন ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে না থাকে। (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ১০/১৬৫)

কৃত্রিম চুল যদি Hair Transplantation এর মাধ্যমে স্থায়ীভাবে বসিয়ে নেয়া হয়, তাহলে মাসাহ বা গোসল সবই ঐ চুলের উপর করতে পারবে। আর যদি তা আলগা হয় তাহলে মাসাহ বা গোসলের সময় কৃত্রিম চুল সরিয়ে মূল মাথায় মাসাহ বা গোসল করবে।

প্রকাশ থাকে যে, হাদীস শরীফে নিষিদ্ধ واصلة والمستوصلة চুল সংযোগকারীনী দ্বারা উদ্দেশ্য হল 'যারা অন্য মানুষের চুল সংযুক্ত করে বা করায়'।

১০. লিপস্টিক (Lip Stick)

[তৈলাক্ত বস্তু দ্বারা প্রস্তুতকৃত প্রসাধনী।] নারীদের ঠোঁটের অন্যতম সাজ। এতে শরঈ কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। কারণ এগুলো ভেদ করে পানি ত্বক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ক্রীম, লোশনের ক্ষেত্রেও একই কথা। আর লিপ লাইনার (Lip Liner) সুরমার ন্যায় রঙের গুড়া। এর মধ্যেও পানি প্রবেশ করে। তাই তার হুকুমও একই হবে। তবে এসব জিনিস ক্রয়ের পূর্বে ব্যবহারকারীনীর দায়িত্ব হল, কোডের আলোকে তার উপাদানগুলো ভালো করে যাচাই নেয়া। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, অনেক সময় এতে হারাম প্রাণীর চর্বি মিশ্রিত থাকে। এমনটি হলে তখন এর ব্যবহারও নাজায়েয হবে। তবে হারাম দ্রব্যের মিশ্রণ নেই এ মর্মে নিশ্চিত হওয়া গেলে তা ব্যবহার করতে অসুবিধা নেই। আর সন্দেহযুক্ত হলে ব্যবহার না করাই উত্তম। (ফাতওয়ায়ে শামী ১/৩২৭, সহীহ বুখারী; হা.নং ২২৩৬)

১১. কপালে টিপ/তিলক (Tilak)

অনেক মহিলাদের কপালে টিপ/তিলক ব্যবহারের ব্যাধি রয়েছে। শাড়ি ও অন্যান্য কাপড়ের সঙ্গে ম্যাচ করে টিপ কেনা হয়। অথচ এটা বিধর্মীদের রীতির অনুসরণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। (সূনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪০৩১) সুতরাং টিপ ব্যবহার অবৈধ ও হারাম।

১২. কন্ট্যাক্ট লেন্স (Contact Lens)

চোখের মণি বড় দেখানোর জন্য বা সাজের সুবিধার্থে চশমার বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত কৃত্রিম মণি। যদি এর ব্যবহারে শারীরিক ক্ষতি না থাকে তাহলে এতে কোন আপত্তি নেই। তবে যদি বিজাতীদের অনুকরণ বা অন্যকে ধোঁকা দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় তাহলে তা অবশ্যই পরিহারযোগ্য।

সুগন্ধি (Perfume)

যেক্ষেত্রে মহিলারা সুগন্ধি ব্যবহার করলে পরপুরুষ মহিলার উপস্থিতি টের পায়, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সুগন্ধি ব্যবহারকারী মহিলাকে ব্যভিচারীনী আখ্যায়িত করেছেন। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৭৮৬) মাসআলা হল, যে সুগন্ধির সুবাস চারিদিকে ছড়ায় মহিলাদের জন্য নির্জনে স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য তা ব্যবহারের অনুমোদন রয়েছে । কিন্তু পরপুরুষের সামনে এমন সুগন্ধি ব্যবহার করা হারাম। তবে যে সুগন্ধি ঘাম ইত্যাদির দুর্গন্ধ দূর করার জন্য ব্যবহার করা হয়, তার সুগন্ধ ব্যবহারকারীনী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকার শর্তে অনুমোদিত।

খেযাব/কলপ (Bleach)

পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে যৌবনকালে চুল সাদা হয়ে গেলে যে কোন রঙের খেযাব বা কলপ ব্যবহার করতে পারবে। আর বার্ধক্যে কেবল মহিলাদের জন্য স্বামীর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কালো খেযাবসহ অন্য সকল রঙের খেযাব ব্যবহারের অনুমতি আছে। কিন্তু কালো চুলকে খেযাব দিয়ে অন্য রঙে পরিণত করা নারী-পুরুষ কারো জন্যেই জায়েয নেই। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৪১৪)

উল্কি (Tattoo)

প্রথমত ট্যাটু বা উল্কি আঁকা অমুসলিমদের সাজ। হাদীস শরীফে উল্কি অঙ্কনকারী ও ব্যবহারকারীর প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানত করেছেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৯৪৮) তাই উল্কি আঁকা নাজায়েয। মনে রাখতে হবে, এক্ষেত্রে পুরুষ মহিলা সকলের জন্য একই হুকুম অর্থাৎ হারাম।

পোশাক পরিচ্ছদ

বর্তমান যুগে মহিলাদের ফ্যাশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল 'পোশাক'। আধুনিকতার হাওয়ায় পুরুষের ফ্যাশন হয় শরীর ঢেকে! আর মহিলার সাজসজ্জা হয় শরীর প্রদর্শন করে। পিঠ, পেট খোলা রেখে কোন সাহেব অফিস তো দূরের কথা, ঘরের বাইরেও যান না। কিন্তু তারই গিন্নি বুক টান করে এসব উন্মুক্ত করে ঘুরে বেড়ান। আর যখন ব্লাউজটা স্লিভলেস (হাতা বিহীন) হয় তখন তো তিনি আল্ট্রা মডার্ন। আফসোস! শুধু ব্লাউজই নয় আজ কামিজও হাতা কাটা দেখা যায়। তার উপর সেটা যদি হয় আঁটোসাটো...।

ইসলামী শরীয়ত মতে মহিলাদের পোশাক হবে ঢিলেঢালা, পুরো শরীরকে আবৃতকারী। এই মূলনীতি ঠিক রেখে যত ডিজাইনই করা হোক শরীয়ত তা অনুমোদন করবে। আর যদি এর বিপরীত হয় তাহলে সে নারী হাদীসে বর্ণিত বিবস্ত্র নারী বলেই গণ্য হবে। ইরশাদ হচ্ছে, অনেক বস্ত্র পরিহিতা বাস্তবে বস্ত্রহীন; যারা পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট এবং তাদেরকে আকৃষ্টকারীনী। এমন মহিলারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি তার ঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ বহু ক্রোশ দূর থেকে পাওয়া যায়। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২১২৮)

আর্টিফিসিয়াল অলঙ্কার (Artificial Ornaments)

দ্রব্যমূল্যের সীমাহীন উর্ধ্বগতির কারণে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের সাজসজ্জার সাশ্রয়ী অলঙ্কার আর্টিফিসিয়াল অলঙ্কার। হাদীস শরীফে স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যতিত অন্য ধাতুর আংটি পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই আংটি ব্যতিত আর্টিফিসিয়াল অন্যান্য অলঙ্কার যেমন গলার চেইন, কানের দুল ইত্যাদি ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে। (ফাতওয়া শামী ৬/৩৬০,৪২০)

(৪৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

আব্দুর রহমান
কলাবাগান, ঢাকা

১৯৬ প্রশ্ন : আমাদের পার্শ্ববর্তী মসজিদের খতীব সাহেবের জুমু'আর বয়ান, তাফসীর ইত্যাদি ভিডিও করা হয়। সাথে সাথে তার বয়ান ও তাফসীর ইন্টারনেটে ছেড়ে দেয়া হয়। আর খতীব সাহেব এটাকে জায়েয মনে করেন। জানার বিষয় হল, মসজিদে বা মসজিদের বাইরে বয়ান ভিডিও করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : শরীয়ত স্বীকৃত প্রয়োজন ছাড়া প্রাণীর ছবি ধারণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। চাই তা ওয়ায মাহফিল, তাফসীর অনুষ্ঠান যা-ই হোক না কেন। হাদীস শরীফে ছবির ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এবং কঠিন শাস্তির হুশিয়ারী এসেছে। ভিডিওর ভিত্তি মূলত ছবির উপরই।

কোন ইমাম সাহেবের ওয়ায ও তাফসীর ভিডিও করে প্রচার করতে হবে এমন প্রয়োজন শরীয়ত স্বীকৃত নয়। তার বয়ান যদি এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে তা ছবিবিহীন অডিও রেকর্ডের মাধ্যমে প্রচার করা যেতে পারে। কেউ প্রয়োজন মনে করলে অডিও বয়ান শুনেই উপকৃত হতে পারবে। এর জন্য ছবির গুনাহে লিপ্ত হওয়ার অবকাশ নেই।

শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হল, কোন কাজে লাভ-ক্ষতি উভয়টার আশঙ্কা থাকলে সে কাজ বর্জনীয়। সুতরাং ওয়াযের লাভ আর প্রাণীর ছবি ধারণ করার গুনাহ যখন একত্রিত হবে, তখন গুনাহ থেকে বাঁচার স্বার্থে ঐ পদ্ধতি বর্জন করতে হবে। এতদসত্ত্বেও কেউ যদি প্রয়োজন ব্যতিরেকে এমন কাজ করে তবে তাদের কাছে তাকওয়া-পরহেযগারীর কোন গুরুত্বই নেই। দীনের ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারী ফ্যাশনপূজারী কিছু লোক এসকল কাজে তাদের সমর্থন যোগায়। অথচ অন্যের উপকার করতে গিয়ে নিজে গুনাহে লিপ্ত হওয়া যে স্পষ্ট বোকামী এ সহজ বিষয়টিও তাদের বোধগম্য নয়।

উল্লেখ্য, শরীয়তের দলীল হল, কুরআন-সুন্নাহ। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কাজ বা অপব্যাখ্যা কিংবা মনগড়া ব্যাখ্যা কখনো শরীয়তের দলীল হওয়ার যোগ্য নয়। বহু হাদীসের আলোকে প্রাণীর ছবি অঙ্কন, ধারণ ও সংরক্ষণ নিষিদ্ধ ও পরকালে কঠিন আযাবের কারণ বলে বিবৃত হয়েছে। কাজেই দীন প্রচারের খোঁড়া যুক্তিতে তা বৈধ হয়ে যাবে না। দীন প্রচারের জন্য ছবি মোটেও জরুরী নয়। সুতরাং এমন কাজ থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরী।

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, হযরত নাফে' রাযি. এর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যারা এ জাতীয় (প্রাণীর) ছবি তৈরি করে, কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দেয়া হবে। তাদের বলা হবে, তোমরা যা বানিয়েছিলে তাতে প্রাণ সঞ্চার করো। (সহীহ বুখারী; হা.নং৫৫২৭)

হাদীসে গাছপালা এবং যার প্রাণ নেই, এমন বস্তুর ছবি অঙ্কনের অনুমোদনের কথাও রয়েছে। হযরত সাঈদ ইবনে আবুল হাসান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস রাযি. এর কাছে এসে বলল, আমি এসব ছবি এঁকে থাকি; তাই এ বিষয়ে আপনি আমাকে ফতওয়া দিন। তিনি বললেন, তুমি আমার নিকট এসো। সে তার কাছে এলে তিনি বললেন, আরো কাছে এসো। সে আরো কাছে এলে তিনি তার মাথায় হাত রেখে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যা শুনেছি তা তোমাকে বলে দিচ্ছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক ছবি অঙ্কনকারী জাহান্নামী হবে। তার অঙ্কিত প্রতিটি ছবিতে প্রাণ দেয়া হবে, তখন সেগুলো জাহান্নামে তাকে আযাব দিতে থাকবে। তিনি আরো বললেন, তোমাকে একান্ত যদি (তা) করতেই হয়, তাহলে গাছ এবং যার প্রাণ নেই, সে সবের (ছবি) তৈরি করো। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৫৩৫৯)

উল্লেখ্য, ইমাম বুখারী রহ. ও ইমাম মুসলিম রহ. হাদীস দু'টি পোশাকের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া দ্বিতীয় হাদীসটিতে গাছপালা এবং প্রাণহীন বস্তুর ছবি অঙ্কনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যারা বলে নিষিদ্ধ ছবি দ্বারা উদ্দেশ্য হল আয়তন বিশিষ্ট মূর্তি, তাদের কথা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ পোশাকে অঙ্কিত ছবি ছবিই হয়; আয়তন বিশিষ্ট মূর্তি নয়। তেমনিভাবে সাধারণত গাছপালার দৃশ্যই অঙ্কন করা হয়, মূর্তি তৈরি করা হয় না।

(সূরা বাকারা- ২১৯, সূরা হাশর- ৭, সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৮৭৩, ৫৯৫৩, ৫৯৬৩, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৯৯, ২১১০, আলকাওয়াইদুল ফিকহিয়্যা ১/২৩৮, মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে বায ৫/৩৭৫, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩৫০)

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

১৯৭ প্রশ্ন : জনৈক মহিলা দেড় বছর কিংবা দুই বছর যাবত অসুস্থাবস্থায় বিছানায় শায়িত। সে উঠতেও পারে না, বসতেও পারে না। অন্যের সাহায্য ছাড়া খানা-পিনাও করতে পারে না। তবে অন্যের কথা শোনে এবং বুঝতে পারে; কিন্তু নিজে কথা বলতে পারে না। এমতাবস্থায় উক্ত মহিলার নামায-রোযার হুকুম কি?

উত্তর : যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ঠিক থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর নামায ফরয থাকে; অন্যথায় ফরয থাকে না। জ্ঞান-বুদ্ধি ঠিক থাকার পর যদি শারীরিক অসুস্থতা বা বার্ধক্যের কারণে সাধারণ নিয়ম

অনুযায়ী তথা দাঁড়িয়ে বা বসে নামায পড়া সম্ভব না হয়, তাহলে শুয়ে ইশারায় নামায আদায় করবে। তা-ও সম্ভব না হলে এ অবস্থা যদি একদিনের বেশি সময় বিদ্যমান থাকে তাহলে তার দায়িত্ব থেকে নামায মাফ হয়ে যায়। আর রোযার ক্ষেত্রে হুকুম হল, যদি উক্ত মহিলা রোযা রাখতেও অক্ষম হয় এবং ভবিষ্যতে তার দ্বারা রোযা রাখার কোন আশাও না থাকে, তাহলে তার উপর রোযা রাখা জরুরী নয়। প্রতিটি রোযার পরিবর্তে সদকায়ে ফিতর তথা ১৬৫০ কিলোগ্রাম গম, আটা বা তার মূল্য ফিদয়া দিলেই যথেষ্ট হবে।
(আদ্দুররুল মুখতার ২/৭৪, আলবাহরুর রায়িক ২/২০৪, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/৬৭১)

ইমরান মাহমূদ
দক্ষিণ মনিপুর, ঢাকা

১৯৮ প্রশ্ন : আসরের পর উমরী কাযা পড়লে প্রকাশ্যে পড়বে না গোপনে পড়বে?

উত্তর : কাযা নামায এমনভাবে আদায় করবে যেন কেউ বুঝতে না পারে যে, সে কাযা নামায আদায় করছে, নাকি কোন নফল নামায। চাই তা আসরের পরে আদায় করুক কিংবা অন্য সময়। কারণ কাযা করা গুনাহের কাজ। আর গুনাহের কাজ প্রকাশ করাও গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। তবে যেহেতু আসরের নামাযের পর নফল পড়ার কোন অবকাশ নেই, তাই আসরের নামাযের পর কাযা নামায লোকদের অগোচরে পড়াই উত্তম।
(সহীহ বুখারী; হা.নং ৬০৬৯, আদ্দুররুল মুখতার ১/৩৯১, ২/৭৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১১/৪৫৩)

আবুল কাসেম
বারিধারা, ঢাকা

১৯৯ প্রশ্ন : আমি মাঝে মাঝে এমন লোকদের সঙ্গে তাবলীগে যাই; যাদের মধ্যে কারো কারো উপার্জন হালাল আবার কারো কারো উপার্জন হারাম। ইজতিমায়ী রান্না-বান্নার ক্ষেত্রে যাদের অধিকাংশ উপার্জন বা সম্পূর্ণ উপার্জনই হারাম তাদের সঙ্গে জামাআতে বের হওয়া বৈধ হবে কি? আর এমন লোকদের টাকা গ্রহণ করে অন্য সাথীরা খেতে পারবে কি? সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন?

উত্তর : যদি সকল সাথী থেকে ইজতিমায়ীভাবে টাকা তুলে একত্রিত করা হয়, অতঃপর নিজেদের প্রয়োজন তথা খানা-পিনা ইত্যাদিতে খরচ করা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে তাবলীগে যাওয়া এবং একত্রে খানা-পিনা করা জায়েয আছে এ হিসেবে যে, প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ অংশই ভোগ করছে; অন্যের অংশ নয়। সম্ভব হলে এমন অবস্থাকেও এড়িয়ে চলা উচিত।
তবে এমন সাথীরা কখনো ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত করতে চাইলে অন্যদের জন্য তা গ্রহণ করা এবং খাওয়া জায়েয নয়। তেমনিভাবে যদি পালা-বদল হিসেবে প্রত্যেক সাথী পুরো জামাআতের খরচ বহন করে, সেক্ষেত্রেও হারাম উপার্জনকারীর খানা-পিনা গ্রহণ করা নাজায়েয।
(আদ্দুররুল মুখতার ২/২৯১, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/১৪৮)

মাওলানা আবুল হাসান
কাঁঠালিয়া, নরসিংদী

২০০ প্রশ্ন : বর্তমানে কিছু বক্তাকে দেখা যায়, বক্তৃতা ঠিকই পুরুষের সামনে করেন। কিন্তু প্রজেক্টরের মাধ্যমে পর্দার সাহায্যে বক্তার ছবি এবং তার বক্তৃতার অবস্থা মহিলাদেরকেও দেখানো হয়। জানার বিষয় হল, এভাবে প্রজেক্টরের মাধ্যমে বক্তাকে দেখা মহিলাদের জন্য জায়েয আছে কি না?
কোন কোন মাওলানা সাহেব বলেন যে, এভাবে দেখা জায়েয আছে। তাদের একথা সঠিক কি না?

উত্তর : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন,
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ.
অর্থ : হে নবী! আপনি মুমিন নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থান সংযত রাখে। (সূরা নূর- ৩১)
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উম্মে সালামা রাযি.এর বর্ণনা, একদিন আমি এবং মাইমুনা রাযি. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অবস্থান করছিলাম। ইতোমধ্যে হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম রাযি. (যিনি একজন অন্ধ সাহাবী ছিলেন) নবীজীর নিকট আসলেন। এটি ছিল পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা। তখন নবীজী আমাদেরকে বললেন, তোমরা দু'জন এ সাহাবী থেকে পর্দার আড়ালে চলে যাও। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে তো অন্ধ মানুষ; সে আমাদেরকে দেখতেও পারে না, চিনতেও পারে না। (তাহলে আর পর্দার আড়ালে যাওয়ার কী প্রয়োজন?) তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে অন্ধ, তাই বলে কি তোমরাও অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছো না? (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৭৭৮, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪১১২)
উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসের আলোকে একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদের জন্য বিনা প্রয়োজনে পুরুষের প্রতি তাকানো অনুচিত। বরং যদি ফিতনা বা কামভাবের আশঙ্কা থাকে তাহলে তাকানো নাজায়েয ও হারাম। (ফাতাওয়া শামী ৬/৩৭১)
প্রশ্নে বর্ণিত সূরতে মহিলাদের কাছে মাইক, সাউন্ডবক্স ইত্যাদির মাধ্যমে শুধুমাত্র বক্তার বয়ানের আওয়াজ পৌঁছানোই যথেষ্ট। পর্দার মাধ্যমে বক্তা ও অন্যান্য পুরুষদের ছবি দেখার ব্যবস্থা করার কোন প্রয়োজন নেই এবং এতে করে শ্রোতাদের বিশেষ কোন দীনী উপকারও হয় না। বরং দীর্ঘ সময় ধরে বেগানা পুরুষের প্রতি মহিলাদের নযর জমিয়ে দেখার সুযোগ করে দেয়ার মধ্যে রয়েছে ফিতনার প্রবল আশঙ্কা। কাজেই শরীয়ত মতে এমন অহেতুক কাজ জায়েয হওয়ার প্রশ্নই আসে না।
যে সকল মাওলানা সাহেব ইলেক্ট্রনিক পর্দার আশ্রয়ে মহিলাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার জন্য দৃষ্টিনন্দন কারুকার্যময় পোশাকে পর্দায় হাযির হন এমন কারো কথা শরঈ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য নয়।
(সূরা নূর- ৩১, সূরা মুমিন- ৩, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৩১৮, সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৩৯৭৬, মুসনাদে

আহমাদ; হা.নং ১৭৩৭, মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাদ; হা.নং ৯৪৯, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩৭১, শরহুন নববী আলা মুসলিম ১০/৯৬-৯৭, আলমউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আলকুওয়াইতিয়্যা ৩১/৫১, বাদায়িউস সানায়ি' ৫/১২২-১২৩)

মুহাম্মাদ আরিফুল ইসলাম
বছিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

২০১ প্রশ্ন : বিভিন্ন সময় দেখা যায়, ইসলামী রাজনীতির বেশ উল্লেখযোগ্য উলামায়ে কেরাম সংবাদ সম্মেলন/ সেমিনারের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করে থাকেন। এতে দেখা যায়, ফটো সাংবাদিকগণ তাদের ছবি তুলে তা পত্রিকায় প্রকাশ করেন। আর অন্যদিকে টেলিভিশনে তা প্রচার করা হয়। হরতাল বা যে কোন কর্মসূচী দিতে সংবাদ সম্মেলন করা হয়।

প্রশ্ন হল, **(ক)** আলেমদের ছবি তোলা বা তুলতে দেয়া কতটুকু শরীয়ত সম্মত? বিভিন্ন টক-শোতে (ইসলামী ভাবধারার) কওমী অঙ্গনের প্রথম সারির আলেমদের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। অথচ একটি সময় বলা হত, কোন অবস্থায়ই টেলিভিশনে যাওয়া যাবে না। কিন্তু এখন এর ব্যতিক্রম।

(খ) মসজিদের ভিতর সি.সি. ক্যামেরার বিধান কি?

(গ) টিভিতে ইসলামিক অনুষ্ঠান (হিফয প্রতিযোগিতা ইত্যাদি) সম্প্রচার সম্পর্কে ইসলাম কি বলে? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : (ক) শরীয়তের বিধান আরোপিত হওয়ার ক্ষেত্রে হাতে আঁকা ছবি, মাটি-পাথর ইত্যাদি দ্বারা তৈরি মূর্তি বা প্রতিকৃতি এবং ক্যামেরায় ধারণকৃত ছবি ও ভিডিওর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। প্রাণীর ছবি হলে সবগুলোই নাজায়েয ও হারাম এবং মারাত্মক গুনাহের কাজ। এতে আল্লাহ তা'আলার একক বিশেষ গুণ সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন।

তবে হ্যাঁ, শরীয়ত স্বীকৃত কোন ওযরের কারণে যদি ছবি তুলতে হয়, তাহলে তা ভিন্ন বিষয়। যেমন কোথাও ছবি তোলা রাষ্ট্রীয় আইনের কারণে বাধ্যতামূলক হয় অথবা ছবি ছাড়া জালিয়াতি রোধ করা যায় না বা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না ইত্যাদি। প্রচলিত বিভিন্ন টক-শো বা সংবাদ সম্মেলন সে ধরনের প্রয়োজনের আওতায় পড়ে না। আর পত্রিকায় উলামায়ে কেরামের ছবি ছাপানোর প্রয়োজন তো মোটেই বোধগম্য নয়। কাজেই এ জাতীয় ক্ষেত্রেও ছবি ব্যবহারের অবকাশ নেই। কেউ করলে তার কৈফিয়ত তিনিই দিবেন। হ্যাঁ, বড় ধরনের কোন সঙ্কটকালে বা কোন বাতিলের মোকাবেলায় সংবাদ সম্মেলন বা টক-শোতে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হলে সেটার হুকুম ভিন্ন হতে পারে। এছাড়া কোন মাহফিল বা সম্মেলনে সংবাদকর্মীদেরকে না ডাকা সত্ত্বেও তারা এসে অনুমতি না নিয়ে ছবি তুলে নিলে সেজন্য আলেমগণ দায়ী হবেন না।

(সূরা বাকারা- ২১৯, সূরা হাশর- ৭, সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৮৭৩, ৫৯৫১, ৫৯৫৩, ৫৯৬৩, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৯৯, ২১১০, আলআশবাহ ওয়ান্নাযাইর; পৃষ্ঠা ৭৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৯/২৭৯, আহসানুল ফাতাওয়া ৮/১৯১, কিতাবুল ফাতাওয়া ৬/১৬৭, ১৬৮, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৮/৪৫৭, ৪৭৬)

(খ) যদি বিশেষ পরিস্থিতিতে মসজিদে সি.সি. ক্যামেরা লাগানোর প্রয়োজন সাব্যস্ত হয় (উদাহরণ স্বরূপ অবস্থানগত কারণে সি.সি. ক্যামেরা না লাগালে মসজিদের নিরাপত্তায় ব্যাঘাত ঘটে), তাহলে এই ক্যামেরাকে শুধু প্রয়োজন পরিমাণেই সীমাবদ্ধ রাখার শর্তে মসজিদে লাগানোর অবকাশ আছে।

(সহীহ মুসলিম; হা.নং ৬৯, ৫৬১, ১৬, ৫২৮, আলআশবাহ ওয়ান্নাযাইর; পৃষ্ঠা ৭৩, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩৫০, কিতাবুল ফাতাওয়া ৬/১৬৮)

(গ) শরীয়ত স্বীকৃত প্রয়োজন ব্যতীত প্রাণীর ছবি সম্পূর্ণ হারাম। আর হিফয প্রতিযোগিতা বা অন্যান্য ইসলামী অনুষ্ঠান টেলিভিশনে সম্প্রচার করা কোন ধরনের প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর শরীয়তের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি এই যে, কোন কাজে যদি লাভ এবং ক্ষতি উভয়টাই বিদ্যমান থাকে, তাহলে সে কাজ বর্জন করা জরুরী। সুতরাং টেলিভিশনে ইসলামী অনুষ্ঠান দেখা বা শোনার লাভ, আর প্রাণীর ছবি ধারণ করার গুনাহ যখন একত্রিত হবে তখন গুনাহ থেকে বাঁচার স্বার্থে ঐ পদ্ধতি বর্জন করতে হবে। সুতরাং দীন প্রচারের খোঁড়া যুক্তিতে তা বৈধ হয়ে যাবে না।

(আলকাওয়াইদুল ফিকহিয়্যা ১/২৩৮, আলআশবাহ ওয়ান্নাযাইর; পৃষ্ঠা ৭৮, মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে বায ৫/৩৭৫, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৮/৪৪২, ৪৪৩)

সালমা বেগম
নেসারাবাদ, পিরোজপুর

২০২ প্রশ্ন : গত ৩০ জানুয়ারি ২০১৪ইং আমার বিবাহ হয়। পরস্পর ভুল বোঝাবুঝির ভিত্তিতে আমি বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেই। অতঃপর না বুঝে কাজি অফিসে গিয়ে ডিভোর্স লেটার পাঠাই। আমার স্বামী এখনো আমাকে মৌখিক বা লিখিত কোনভাবে তালাক প্রদান করেনি। এখন ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক আমাকে কি করতে হবে?

উত্তর : নিকাহনামায় তালাকে তাফবীযের জন্য যে সকল শর্ত দেয়া হয়েছে, সে সকল শর্তের বাস্তব অস্তিত্বের ভিত্তিতে যদি আপনি ডিভোর্স লেটার পাঠিয়ে থাকেন তাহলে আপনার উপর এক তালাকে বায়েন পতিত হয়েছে। এখন যদি আপনি পুনরায় উক্ত স্বামীকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে চান তাহলে বিবাহের সকল শর্ত বজায় রেখে আপনারা দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবেন। তবে সেক্ষেত্রে আপনার স্বামীর অধিকারে অবশিষ্ট দুই তালাক প্রদানের ক্ষমতা বাকী থাকবে।

আর যদি কাবিননামার উল্লিখিত শর্ত না পাওয়া সত্ত্বেও মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে তালাকনামা পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে তালাক গ্রহণ করা বেকার হয়েছে। ফলে কোন প্রকার তালাক পড়েনি এবং একসঙ্গে ঘর-সংসার

করার ক্ষেত্রে পুনরায় বিবাহের প্রয়োজন নেই।
(রদ্দুল মুহতার ৪/৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৬, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৪/৪৭৭, বাদায়িউস সানায়ি' ৪/২০৭, ২৫৭)

আব্দুল্লাহ
গাজীপুর

২০৩ প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি নিজ জমিতে নিজ খরচে বাড়ি নির্মাণ করার ইচ্ছা পোষণ করেছে। সে একটি কোম্পানীর সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি করতে চাচ্ছে যে, কোম্পানী তার বাড়ি নির্মাণ করে দিবে এবং এ কাজের বিনিময় হিসেবে তারা নির্মাণব্যয়ের এক দশমাংশ সমপরিমাণ টাকা নিয়ে নিবে। তার এ চুক্তি বৈধ হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত সূরতে ঐ ব্যক্তির জন্য কোম্পানীর সঙ্গে (ইজারার এই) চুক্তি করা জায়েয হবে। কেননা চুক্তির সময় কোম্পানীর কাজের বিনিময় নির্দিষ্ট একটি অংক নির্ধারিত না হলেও কাজের শেষে বাড়ি নির্মাণের মোট খরচের আনুপাতিক হার হিসেবে নির্ধারিত হয়ে যাবে। কোম্পানী কাজের শেষেই মূলত কাজের বিনিময়ের অধিকারী হবে। অতএব কাজের শেষে বিনিময় নির্ধারিত হওয়াই যথেষ্ট।
(মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ২১১০৯, আলমুহীতুল বুরহানী ৯/১৯৬, আলমউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আলকুওয়াইতিয়্যা ১/২৬৩, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৩৪৩)

আনিসুর রহমান
শেখেরটেক, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

২০৪ প্রশ্ন : এক ব্যক্তি তার ৪ শতক নিজস্ব জমি মসজিদ ও মাদরাসার জন্য ওয়াকফ করেছেন। এখন উক্ত জমির উপর মসজিদ পাকা করে দ্বিতীয়/তৃতীয় তলায় মাদরাসা চালু করা যাবে কি না? যদি চালু করা যায় তবে কোন তলায় মসজিদ আর কোন তলায় মাদরাসার কাজে ব্যবহার করতে হবে?

উত্তর : মসজিদ-মাদরাসার জন্য যৌথভাবে জমি ওয়াকফ করার কারণে শরীয়ত মতে ওয়াকফ পূর্ণাঙ্গ হয়নি। এখন করণীয় হল, মসজিদ-মাদরাসার জমি পৃথক করবে। এরপর মসজিদের জমিতে মসজিদ আর মাদরাসার জমিতে মাদরাসা নির্মাণ করবে।
আর জমি ছোট হওয়ার কারণে পৃথক করা ক্ষতিকর বা সম্ভব না হলে পুরা জমি মাদরাসা কমপ্লেক্স নামে ওয়াকফ করবে। অতঃপর তাতে মাদরাসা ভবন নির্মাণ করে মাদরাসার প্রয়োজনে সুবিধা অনুযায়ী কোন এক তলা মসজিদের জন্য নির্ধারণ করবে।
(আদ্দুররুল মুখতার ৪/৩৪৩, ৩৫৭, মাজমাউল আনহুর ২/৫৭৩, ফাতহুল কাদীর ৫/৪২৬, ৪৪৫, আলবাহরুর রায়িক ৫/২১৩, ৩২৯, ফাতাওয়া বাযযাযিয়া ৩/১৩৭, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৮/১৬০, আলহিদায়া ৩/২১৯, জাওয়াহিরুল ফিকহ ৩/১৩৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২২/২৩)

হাজী মুহাম্মাদ মা'রূফ হোসেন
হাজারীবাগ, ঢাকা

২০৫ প্রশ্ন : ঈদে মীলাদুন্নবীর দিন বা ঈদে মীলাদুন্নবী উপলক্ষে অন্য কোন দিন এলাকার মুসল্লী বা পঞ্চায়েতের বাড়ি বাড়ি লোকজনকে গরু জবাই করে খাওয়ানো হয় এবং এক্ষেত্রে মুসল্লীদের থেকে চাঁদা তুলে কিংবা মসজিদের ফান্ডের টাকা খরচ করা হয়। এটা জায়েয আছে কি না? মসজিদের টাকা খরচ করা গুনাহ বা বিদ'আত কি না?

উত্তর : শরীয়তে মনগড়া ইবাদতের বৈধতা নেই। ইবাদতের মৌলিক বুনিয়াদ হল কুরআন এবং সুন্নাহ। এছাড়া শরীয়তের দৃষ্টিতে ইবাদত নয় এমন কোন কাজ ইবাদতের নামে করা হলে সেটা বিদ'আত ও গোমরাহী সাব্যস্ত হবে। হাদীস শরীফে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী; আর প্রত্যেক গোমরাহী জাহান্নামে টেনে নিয়ে যাবে। (সুনানে নাসায়ী; হা.নং ১৫৭৮)
কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী মুসলমানদের ঈদ দুইটি- ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। তৃতীয় কোন দিনকে ঈদ হিসেবে পালন করার বর্ণনা কুরআন-সুন্নাহয় নেই।
প্রচলিত ঈদে মীলাদুন্নবী একটি বিদ'আত ও বিজাতীয় প্রথার অনুসরণ; কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে যার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। সাহাবা, তাবেঈন এবং তাবে' তাবেঈন এই তিন সোনালী যুগে যার কোন অস্তিত্ব ছিল না। কুরআন-সুন্নাহয় ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের আলোচনায় দুই ঈদের অধ্যায় আছে এবং এ সংক্রান্ত মাসাইলের আলোচনা আছে; কিন্তু ঈদে মীলাদুন্নবী নামে না কোন অধ্যায় আছে, না তার ফাযাইল ও মাসাইলের আলোচনা আছে।
এ ঈদ যেমন মনগড়া, তা পালনের রীতিও মনগড়া। এক্ষেত্রে যেসব ফযীলতের কথা বর্ণনা করা হয়, সেসবও বানোয়াট। নির্ভরযোগ্য কোন হাদীসের কিতাবে সেগুলোর নামগন্ধও নেই। প্রমাণের জন্য আপনারা অনুবাদকৃত প্রসিদ্ধ হাদীসের ও ফিকহের কিতাবগুলো খুলে দেখুন। সেগুলোতে দুই ঈদের কথা অতি স্পষ্টভাবে পাবেন; কিন্তু কথিত শ্রেষ্ঠ ঈদের আলোচনা কোথাও খুঁজে পাবেন না।
সর্বপ্রথম ৬০৪ হিজরীতে ইরবিলের স্বেচ্ছাচারী বাদশাহ মালিক মুযাফফর আবূ সাইদ কুকবুরী (মৃত ৬৩০ হি.) এই ঈদের সূচনা করে। এরপর তার দেখাদেখি অন্য লোকেরাও শুরু করে।
সুতরাং শরীয়তের দৃষ্টিতে দীনের নামে এ জাতীয় অনুষ্ঠান উদযাপন করা মারাত্মক বিদ'আত ও নাজায়েয কাজ; যা বর্জন করা জরুরী। একে কেন্দ্র করে লোকদের থেকে চাঁদা তোলা ও গরু জবাই করে খাওয়ানো চরম পর্যায়ের মূর্খতা ও গোমরাহী।
আর মসজিদের ফান্ড থেকে এ কাজের জন্য ব্যয় করা তো মারাত্মক অন্যায় ও গুনাহের কাজ। কোন মসজিদ কর্তৃপক্ষ এমনটি করলে তারা এ কাজে উৎসাহী অন্যদের গুনাহের জন্যও দায়ী থাকবেন।
(সূরা হাশর- ৭, সূরা মায়িদা- ২, সহীহ বুখারী; হা.নং ২৬৯৭, আদ্দুররুল মুখতার ১/৫৬০-৫৬১, ৪/৩৬৪, আলহাবী ১/২২২-২২৩, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ১/৩৬২, ফাতাওয়া বাযযাযিয়া ২/৩৮৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৫/৩৯৬)

আহমাদ
সেনপাড়া, মিরপুর, ঢাকা

২০৬ প্রশ্ন : হাদীসে মুআযযিনের বড় বড় অনেক ফযীলতের কথা এসেছে। কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, যে ব্যক্তি বারো বছর আযান দিবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। এছাড়া আরো অনেক ফযীলতের কথা বর্ণিত আছে।

আবার হাদীসে মুআযযিন কেমন হবে, তার বিবরণও এসেছে। এক হাদীসে আছে, বিনিময় নেয় না এমন মুআযযিন নির্বাচন করো।

এখন জানার বিষয় হল, বর্তমানে যারা আযান দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করে তারা উক্ত ফযীলত পাবে কি না? যদি পায়, তাহলে ঐ হাদীসের ব্যাখ্যা কী হবে, যেখানে বিনিময় না নেয়ার শর্ত করা হয়েছে? বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর : শরঈ বিধান মতে যে কাজ ইবাদত হিসেবে তথা সওয়াবের আশায় করা হয়, মানুষের কাছে থেকে তার বিনিময় নেয়া জায়েয নেই। বলাবাহুল্য, আযানও একটি ইবাদত। আর মুআযযিন সাহেব সওয়াবের উদ্দেশ্যেই আযান দিয়ে থাকেন। সে হিসেবে আযানের বিনিময় গ্রহণ করা নাজায়েয। মুতাকাদ্দিমীন তথা পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের অভিমতও এটাই। হাদীসের ভাষ্যও তাই।

কিন্তু মুতাআখখিরীন তথা পরবর্তী যুগের আলেমগণ দীন রক্ষার স্বার্থে এর বিনিময় নেয়াকে জায়েয বলেছেন। কেননা ইসলামের শুরু যামানায় দীনের খাদেমদের জন্য রাষ্ট্রীয় ভাতার ব্যবস্থা ছিল। ফলে জীবন ধারণের জন্য তাদের জীবিকা অর্জনের ফিকির করতে হতো না। পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় ভাতা বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে আযান, ফরয-ওয়াজিব নামাযের ইমামত ও কয়েকটি ইবাদতের ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক গ্রহণের আবশ্যকতা দেখা দেয়। কেননা নিয়মিত পারিশ্রমিকে দীনী তা'লীমের ব্যবস্থা না থাকলে, সে সকল ইবাদতের ক্ষেত্রে কোন শৃঙ্খলা বজায় থাকবে না। বরং চালু রাখাও অসম্ভব হবে।

উদাহরণ স্বরূপ আযান দেয়া সওয়াবের কাজ হলেও নির্দিষ্ট কোন স্থানে, নিয়মিত আযান দেয়ার লোক পাওয়া যাবে না। অনুরূপ অবস্থা ইমামতি ও শিক্ষকতার ক্ষেত্রেও। অথচ এসকল ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখা শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকেই কাম্য। সুতরাং সে প্রেক্ষিতে এর বৈধতার ব্যাপারে সকল উলামায়ে কেরাম একমত পোষণ করেছেন। অর্থাৎ এর উপর ইজমা হয়ে গেছে।

বাহ্যিকভাবে এটা হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত মনে হলেও প্রকৃত অর্থে তাতে কোন বৈপরিত্য নেই। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানা থেকে খিলাফতে আব্বাসিয়া পর্যন্ত হুকুমত ইমাম-মুআযযিনের কাফালাত (ভরণ-পোষণ) বহন করত। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাদের বেতন-ভাতা দেয়া হত, যা জনগণের মালের সমষ্টি। পরবর্তীতে এ প্রথা বিলুপ্তির পর জনগণ তাদের কাফালত বহন করে। পার্থক্য এতটুকু যে, সে যুগে হুকুমতের মাধ্যমে দেয়া হত আর এখন হুকুমত না থাকায় সরাসরি দেয়া হয়। অতএব হাদীসে বর্ণিত আযানের ফযীলত লাভের ক্ষেত্রে বিনিময় গ্রহণ করা প্রতিবন্ধক হবে না।

তবে ফযীলতের বিষয়টি নিয়তের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং সওয়াবের নিয়তে ইখলাসের সঙ্গে মুআযযিনী করলে, ভাতা গ্রহণ করা সত্ত্বেও হাদীসে বর্ণিত ফযীলতের অধিকারী হবে। তবে যারা এ খিদমতের জন্য দর কষাকষি করে, তার দাবী পূরণ না করলে সে এ খিদমত করবে না বা কোথাও ২/৪শ টাকা বেশি বেতন দিলে সেখানেই দৌড়ায়, এ ধরনের লোক ঐ হাদীস অনুযায়ী আযানের ফযীলত পাবে না; যদিও বেতন হালাল হবে।

(তানকীহুল ফাতাওয়া ২/১৩৭, রাসাইলে ইবনে আবিদীন ১/১৫৭, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৫৫, আলবাহরুর রায়িক ৮/৩৫, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৫/১২৭, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৩৪০, তুহফাতুল আলমাঈ ১/৫৩২)

আনওয়ার হুসাইন
আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ

২০৭ প্রশ্ন : ঘরে টিভি চলে, মেয়ে বেপর্দা হয়ে স্কুলে যায়, স্ত্রী পর্দাহীনভাবে চাকরী করে। এক ছেলে হাইস্কুলে চাকরী করে; যেখানে ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে ক্লাস করে। আরেক ছেলে ভার্সিটিতে পড়ালেখা করে। ছেলেদের দাড়ি নেই; নামাযও পড়ে না। যার পরিবারের দীনদারীর এই দুরবস্থা, এমন ব্যক্তি যদি নিজেকে পীর দাবী করে, তা গ্রহণযোগ্য হবে কি না? তার মুরীদ হওয়া বা তাকে অনুসরণ করা যাবে কি না? বিস্তারিত জানালে বাধিত হব।

উত্তর : টিভি দেখা, যারা মাহরাম নয় এমন ব্যক্তির সামনে বেপর্দাভাবে চলাফেরা করা, অনুরূপভাবে দাড়ি কামানো, নামায না পাড়া প্রত্যেকটাই কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। আর গুনাহের কাজ করতে দেখেও তা হতে তাকে বারণ না করা; বরং তার কাজের প্রতি নীরব দর্শক হয়ে থাকাও গুনাহ । অর্থাৎ যদি কেউ গুনাহের কাজে রত ব্যক্তিকে ফেরানোর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও গুনাহের কাজ হতে বিরত না করে বরং তাদের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখে তাহলে সেও সেই গুনাহের অংশীদার হবে।

সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত সূরতে উক্ত ব্যক্তি যদি তার পরিবারের সদস্যদেরকে উক্ত কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে নিবৃত না করে, বরং সে তাদের কর্মকাণ্ডের উপর নীরব দর্শক হয়ে থাকে, তাহলে সে-ও উক্ত গুনাহের অংশীদার হবে। আর এ ধরনের ব্যক্তি কখনো পীর হতে পারে না। কারণ পীর হওয়ার জন্য অনেকগুলো গুণের অধিকারী হতে হয়। তন্মধ্যে অন্যতম একটি গুণ হল, 'আমর বিল মা'রূফ, নাহী আনিল মুনকার'। অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা। অতএব উক্ত ব্যক্তির নিজেকে পীর দাবী করা সহীহ নয়। তার পীর দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না। অনুরূপ তার মুরীদ হওয়া বা তাকে অনুসরণও করা যাবে না। সে একজন ভণ্ড, বাতিল ও ব্যবসায়ী পীর। এ সব পীরের দ্বারা সাধারণ মানুষের ঈমান নষ্ট হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। অতএব এ ধরনের ভণ্ড পীরদের থেকে মুসলিম জনসাধারণের দূরে থাকা উচিত এবং

সামর্থ্য থাকলে এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ঈমানী দায়িত্ব।

(সূরা আলে ইমরান- ১০৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৬/৩০৫, ৩১২, ইমদাদুল আহকাম ১/৩০০)

বিনতে আলতাফ

২০৮ প্রশ্ন : (ক) কোন্ কোন্ ছবি দেখা নাজায়েয? গাইরে মাহরাম, প্রাণী এবং অশ্লীল ছবি ছাড়া অন্য যে কোন ছবি দেখা জায়েয হবে কি?

অনেকে ভাইবার, ইমো ইত্যাদির প্রোফাইলে নিজের বা নিজের বাচ্চার ছবি দিয়ে রাখেন সেগুলো দেখলে গুনাহ হবে কি? উদাহরণ স্বরূপ আমি ভাইবার/ইমো ব্যবহার করি। আমি আমার প্রোফাইলে কোন ছবি দেইনি। কিন্তু আমার ভাইবার/ইমোর কন্ট্যাক্টে যাদের নাম্বার আছে তারা তাদের প্রোফাইলে নিজেদের বা নিজেদের বাচ্চার ছবি দিয়ে রেখেছে। আমি যখন তাদেরকে ফোন দেয়ার জন্য কন্ট্যাক্টে যাই তখন তাদের ঐ ছবিগুলো আমার নযরে চলে আসে। তো এর দ্বারা আমার কোন গুনাহ হবে কি?

(খ) হাঁস, প্রজাপতি ইত্যাদির শোপিস যার চোখ-মুখ নেই; সেগুলো ঘরে সাজিয়ে রাখা অথবা পশু-পাখির স্টিকার যার চোখ-মুখ নেই বা বোঝা যায় না, তা দেয়ালে বা অন্য কোথাও লাগানো জায়েয আছে কি?

(গ) কার্টুন দেখার বিধান কি?

উত্তর : (ক) যেমনিভাবে জানদার তথা প্রাণীর ছবি বানানো এবং ঘরের মধ্যে রেখে দেয়া বা সংরক্ষণ করা নাজায়েয, অনুরূপভাবে সেগুলো বিনা প্রয়োজনে ও ইচ্ছাকৃতভাবে দেখাও নাজায়েয; যদিও তা কোন মাহরাম ব্যক্তির শালীন ছবি হয়। তবে স্পষ্ট চোখ, মুখ, নাক, কান বিহীন প্রাণী বা মাথা কর্তিত প্রাণীর অসম্পূর্ণ ছবি দেখা জায়েয আছে। এমনিভাবে গাছপালা, লতাপাতা এবং প্রাণহীন অন্য যে কোন বস্তুর ছবি দেখাও জায়েয। ভাইবার বা ইমোর ব্যবহার যদি আপনার জন্য জরুরী হয় আর এগুলোর ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্যদের ছবির উপর অনিচ্ছাকৃতভাবে আপনার দৃষ্টি পড়ে যায় তাহলে এর কারণে কোন গুনাহ হবে না। হ্যাঁ, ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাণীর ছবি দেখতে থাকলে বা বেগানা নারীর ছবির প্রতি নজর দীর্ঘায়িত করলে গুনাহ হবে।

(সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৯৫১, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২১১০, আদ্দুররুল মুখতার ১/৬৪৮, আলমউসূআতুল ফিকহিয়্যা ১২/৯৮, তাসবীর কে শরঈ আহকাম; পৃষ্ঠা ৮৯)

(খ) হাঁস, প্রজাপতি ইত্যাদির শোপিস অথবা পশু-পাখির স্টিকার যেগুলোর চোখ, মুখ, নাক, কান আছে তথা মুখমণ্ডলের স্পষ্ট আকৃতি আছে এগুলোর হুকুম মূর্তির ন্যায়। এগুলো ঘরে সাজিয়ে রাখা কিংবা দেয়ালে বা অন্য কোথাও রাখ জায়েয নেই। আর স্পষ্ট চোখ, মুখ, নাক, কান বিহীন শোপিস বা স্টিকার যেগুলোর মুখমণ্ডলের আকার-আকৃতি বোঝা যায় না এগুলো ঘরে সাজিয়ে রাখা কিংবা দেয়ালে বা অন্য কোথাও লাগানো জায়েয আছে, যদি তা নারীর অনাবৃত দেহ বা পুরুষের অনাবৃত সতর না হয়। তবে বেহুদা ও ফালতু হওয়ায় এগুলো না করা উচিত।

(সহীহ মুসলিম; হা.নং ৩২২৫, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২৯৩২, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৪/৭০, জাদীদ মাসাইল কা হল; পৃষ্ঠা ৪৭৪)

(গ) কার্টুন যদি জানদার বা প্রাণীর হয় আর এগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয় যে, এদের চোখ, মুখ, নাক, কান ইত্যাদি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে এবং এদের পরিচয় বোঝা যায় তাহলে এরূপ কার্টুন দেখা জায়েয নেই। আর যদি এদের আকার-আকৃতি বোঝা না যায় তাহলে এরূপ কার্টুন দেখা জায়েয আছে। এতদসত্ত্বেও এ জাতীয় কার্টুন দেখা থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ এগুলো অনেকাংশেই ছবির সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে। তাছাড়া মুমিন বেহুদা কাজে লিপ্ত হয় না। (সূরা মুমিনীন- ৩, সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৯৫১, ডিজিটাল তাসবীর আওর সিডি কে শরঈ আহকাম; পৃষ্ঠা ১৬৩)

ইবরাহীম খান

২০৯ প্রশ্ন : মাগরিবের আযানের পর ফরযের পূর্বে দুই রাকাআত নামায পড়ার বিধান কি? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : মাগরিবের আযানের পর ফরযের পূর্বে দুই রাকাআত নফলকে অনেক ফকীহ মাকরূহ বলেছেন। তাই না পড়ার মধ্যেই সতর্কতা। হাদীসে এসেছে,

سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا على عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم– يصليهما.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. কে মাগরিবের ফরযের পূর্বে দু-রাকাআত নফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কাউকে মাগরিবের ফরযের পূর্বে দুই রাকাআত নফল পড়তে দেখিনি। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ১২৮৪)

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে,

عن حماد قال: سألت إبراهيم عن الصلاة قبل المغرب فنهاني عنها وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يصلوها.

অর্থ : ইমাম হাম্মাদ রহ. বলেন, ইবরাহীম নাখায়ী রহ.কে মাগরিবের ফরযের পূর্বে দুই রাকাআত নফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি নিষেধ করেন এবং বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর রাযি. ও উমর রাযি. কেউই তা পড়েননি। (কিতাবুল আসার; হা.নং ১৪৫)

(সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪১৬, বাদায়েউস সানায়ে' ১/২৯৭, আদ্দুররুল মুখতার ১/৩২৭, ই'লাউস সুনান ২/৬৯, ৭০, খাইরুল ফাতাওয়া ১/৪৯২)

বিসমিহী তা'আলা

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ায় শিক্ষাসমাপনকারীদের সমন্বয়ে গঠিত

'রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়া'র

বার্ষিক ফুযালা সম্মেলন ২০১৭

স্থান : জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়া

৮ এপ্রিল ২০১৭ শনিবার সকাল ৯টা হতে আসর পর্যন্ত

সম্মেলনে রাবেতার সকল সদস্যকে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো যাচ্ছে

কেন্দ্রের সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও রাবেতার কোনও কোনও সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব না-ও হতে পারে, এজন্য ফুযালায়ে কেরামকে পার্শ্ববর্তী/পরিচিত সদস্যদের সঙ্গে যথাসাধ্য যোগাযোগের অনুরোধ করা যাচ্ছে। দূরবর্তী ফুযালায়ে কেরামকে সম্মেলনের আগের দিন চলে আসার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

জামি'আর পক্ষে

মুফতী মনসূরুল হক
প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

মাওলানা হিফজুর রহমান
প্রিন্সিপ্যাল
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

রাবেতার পক্ষে

মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম আল মাসউদ
আমীর, মজলিসে শূরা
রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়া

ZAHUR & MOSTAFIZ

জেড এম হজ্জ কাফেলা

পরিচালনায়
জেড এম ট্যুরস্ এন্ড ট্রাভেলস লি.

আমাদের সেবাসমূহ

- ফ্রি পাসপোর্ট প্রসেসিং, বিমানের টিকিট, ভিসা, মেডিক্যাল চেকআপ, ডলার এ্যান্ডোর্সমেন্টসহ হজ্জের যাবতীয় কার্যাদী দক্ষতার সাথে সুনিপুণভাবে সম্পাদন করা।
- অভিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের মাধ্যমে হজ্জের যাবতীয় আরকান-আহকামের প্রশিক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করা।
- মক্কা ও মদীনা শরীফে (প্যাকেজ অনুসারে) হারামাইন শরীফাইনের কাছাকাছি বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।
- রুচিসম্মত ও উন্নতমানের খাবার পরিবেশন ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।
- মক্কা ও মদীনা শরীফের ঈমানদীপ্ত দর্শনীয় স্থানসমূহের যিয়ারতের ব্যাবস্থা করা।
- নিয়ম-নীতি, শৃঙ্খলা ও ওয়াদাবদ্ধতার কঠোর নিয়ন্ত্রণ করা।

আপনাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ থাকবে, আপনি হজ্জ পালনে আগ্রহী হলে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন।

হাই টাওয়ার (৮ম তলা), ৯ মহাখালী বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২
মোবাইল: ০১৭৬৬৮৫৯৫১, ০১৭১৬০০২২৫১ (ফয়সাল ফরীদ)
ফোন: +৮৮ ০২-৯৮৫৯৫২৩; ফ্যাক্স +৮৮ ০২-৯৮৪২২৮১
hajj@zmtourstravels.com ; www.zmtourstravels.com

চলে গেলেন শাইখে সানী

আব্দুল হক আ'যমী রহ.

মুহাম্মাদ ইসমাঈল হাসান

তিনি আমাদের ছেড়ে প্রিয় বন্ধুর কাছে চলে গেছেন। দারে জাদীদের চত্বরে তার হুইল চেয়ারের চাকা আর কেউ ঘুরতে দেখবে না। তাঁর অম্লমধুর বকাঝকা আর কেউ শুনবে না। আসরের পরেও দরস করানোর মানুষটি আর রইলো না। বাংলাদেশী তালাবাদের নানা-দাদার আদর দেয়ার শুভ্র দাড়িওয়ালা মানুষটি চিরতরে গা ঢাকা দিলেন। তাঁকে আমরা আর কোন দিন খুঁজে পাবো না। ডুকরে কাঁদছে আমাদের হৃদয়। অভিমানে শোকে খানখান ধরণীর বাতাবরণ।

২০১৬! তুই বড় বেদনাবিধুর। হিসেব করে দেখ, এই বছর তুই কতোজন ভালো মানুষ হারিয়েছিস! দুর্দশা কতোটা পিছু নিলে বছরের শেষ দিনেও হারালি একজনকে! আব্দুল হক আ'যমীর মতো এতো বড় মনীষীকে!

আহ! শুধু বড় আলেমই নন, মানুষ হিসেবেও কতোটা উন্নত ছিলেন তিনি, আমরা কল্পনাও করতে পারবো না! দারুল উলূম দেওবন্দে তিনি ছিলেন সবার মান্যবর, মুরুব্বী। সবাই তাঁকে অগাধ শ্রদ্ধা করতো। মস্তবড় আল্লাহওয়ালাও ছিলেন তিনি। চেহারা দেখলেই মনে হতো কার সাথে যেনো তাঁর গভীর প্রেম, অপার্থিব ভালোবাসা! স্পষ্ট বোঝা যেতো, তিনি তাঁর প্রেমাস্পদের স্মরণে তন্ময়! তবে নানা খুনসুটির আড়ালে তাঁর এই গভীর নিমগ্নতা ঢেকে রাখতেন। কিন্তু আমরা ঠিকই বুঝতাম, তার নিমগ্নতা আল্লাহরই জন্য। তাঁর গভীর প্রেম চলে দিবারাত্রি আল্লাহরই সাথে। এমন মহান মানুষকে চেনা সকল মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য।

জন্ম

আ'যমগড় ভারতের পুণ্যভূমি। অনেক বড়বড় মনীষীর জন্ম এখানে। মুহাদ্দিসে কাবীর আবুল মাআসির হাবীবুর রহমান আ'যমী রহ. পৃথিবীর জন্য এই আ'যমগড়েরই উপহার। আ'যমগড় আমাদের আরো দিয়েছে দেওবন্দের বর্তমান প্রভাবশালী দুইজন মুহাদ্দিস ইবনে হাজারখ্যাত হাবীবুর রহমান আ'যমী দা.বা. ও বাহরুল উলূম খ্যাত নিয়ামাতুল্লাহ আ'যমী দা.বা. কে। এই এমন একটি নগরেই পৃথিবীর বুকে হেসেছিলেন শাইখে সানী আব্দুল হক আ'যমী রহ.।

শিক্ষা জীবন

শাইখে সানী রহ. এর নিজ এলাকাতেই শিক্ষার হাতেখড়ি হয়। তারপর বাইতুল উলূম সারায়মীরে উলূমে আলিয়া অর্জন করেন অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে। অবশেষে উচ্চশিক্ষার জন্য দারুল উলূমের পথ ধরেন এবং এখানেই তাঁর একাডেমিক শিক্ষার অত্যুজ্জ্বল সমাপনী হয়।

মশহুর আসাতিযা

১. শাইখুল আরব ওয়াল আযম হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.।
২. শাইখুল আদীব এ'জায আলী রহ.।
৩. ইমামুল মা'কূল ওয়াল মানকূল ইবরাহীম বালিয়াবী রহ.।

শিক্ষাকতার জীবন

হযরতের শিক্ষকতা জীবনের সিংহভাগ কেটেছে দারুল উলূম দেওবন্দেই। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে দারুল উলূম দেওবন্দের শূরার ঐকমত্যে হযরতকে শাইখুল হাদীস পদে নিয়োগ দেয়া হয়। পাশাপাশি দারুল ইফতায় আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর পাঠদানের খিদমতও ছিল তাঁর দায়িত্বে। অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে ফাতাওয়া বিভাগের খণ্ডকালীন যিম্মাদারীও পালন করেছেন তিনি।

দেওবন্দে আসার পূর্বে তিনি বানারসে ছিলেন ১৬ বছর। দারুল উলূম মাউ-তে তা'লীম-তাদরীসে নিয়োজিত ছিলেন।

অসাধারণ ধী-শক্তি

মৃত্যুর আগমুহূর্তেও তিনি তাঁর খাদেমের পাঠ করা দু'আ-দুরূদের ভুল শুধরে দিয়েছেন।

একবারের ঘটনা, আমি ও আমার সহপাঠী হিশাম হযরতের সোহবতে যাই। কথায় কথায় রাহমানিয়া প্রসঙ্গ আসে। রাহমানিয়ার নাম শোনামাত্রই তিনি রাহমানিয়ার মুরুব্বীদের নাম ধরে ধরে বিভিন্ন কথা বলতে লাগলেন। শাইখুল হাদীস সাহেব রহ., মুফতী সাহেব ও মুমিনপুরী হুযূরসহ অনেক বড় বড় উস্তাদের নাম তাদের গুণাবলীসহ বলে ফেললেন। আমরা তো রীতিমত হতবাক হয়ে গেলাম। বড়দের মুখেও হযরতের মেধার অনেক প্রশংসা শুনেছি।

ইলমের প্রতি ভালোবাসা ও প্রচণ্ড আগ্রহ

দরস-তাদরীস ছিল হযরতের জীবনের একমাত্র ব্যস্ততা। হযরতের বাসায় চারপাশে চোখে পড়তো কিতাবের স্তূপ। এমনকি খাটিয়াটিও কিতাব থেকে খালি নয়। মাওলানা হাবীবুর রহমান আ'যমী দা.বা. বলেন, আমরা হযরতের ইলমী মেহনতের যামানায় রাত দুটোর আগে কখনো তাঁকে শুতে দেখিনি। শেষ জীবনে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। হাঁটতে পারতেন না। তবু হুইল চেয়ারের সাহায্যে দরসে চলে আসতেন। কখনো দরস বাদ দিতে দেখিনি। আসরের পরও দরস করাতেন। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, হযরত যখন হুইল চেয়ারে আসতেন, মনে হতো অন্তিম সময় পার করছেন। কিন্তু দরসে যখন তাকরীর শুরু করতেন, মনে হতো ত্রিশ বছরের তাগড়া জওয়ান। হুযূরের দরসের পুরোটা সময় জুড়ে এক অপার্থিব চাঞ্চল্য ও সজীবতা বিরাজ করতো। যোহরের পর অবসন্ন প্রহরে ঢুলুঢুলু চোখ নিয়ে দরসে বসলেও মাইকে হুযূরের আওয়াজ ভেসে আসামাত্রই ঘুম উড়ে যেতো। সামান্য ত্রুটি হলে তালিবে ইলমদের খুব বকতেন। আহ! কতো মধুর ছিল সেই বকুনীগুলো!

সরল জীবন-যাপন ও বুযুর্গী

তিনি বেলায়াতের কোন স্তরে পৌঁছেছিলেন সেটা বোঝা আমাদের সাধ্যের বাইরে। পুরো দেওবন্দে তিনি সবার কাছে মুস্তাজাবুদ্দাওয়াহ (যার দুআ আল্লাহ নগদ কবুল করেন) হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বাস্তবেই তিনি আল্লাহর কাছে এমন আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে এবং এমন কান্নাকাটি করে চাইতেন, আমাদের মনে হতো তিনি আল্লাহকে দেখছেন, এবং আল্লাহ যে দিচ্ছেন, তিনি যেনো তা স্বহস্তে গ্রহণ করছেন।

যে আল্লাহকে চিনেছে, তার আবার কিসের দুনিয়া! তাই জীবন যাপনে বিলাসিতার প্রতি তাঁর কোন মনোযোগ ছিল না। যা আছে ভাগ্যে, তাই নিয়েই সাদামাটা জীবন পার করে দিয়েছেন

তিনি। ছোট্ট মতো একটা কামরায় থাকতেন। বিছানা পাতা ছিল মেঝেতে । কাপড়-চোপড়ও ছিল অতি সাধারণ। এতোটাই লৌকিকতামুক্ত জীবনযাপন ছিল যে, অনেক সময় ফতুয়া পরেই হাদীসের মসনদে চলে আসতেন।

একবারের ঘটনা, বুখারী খতমের পর তিনি রাত ১২টার দিকে মাকবারায়ে কাসেমিতে গেলেন। পরে শুনেছি এটা নাকি তাঁর প্রতি বছরেরই নিয়ম। মাকাবারায় যেতে হয় মসজিদে রশীদ হয়ে। মসজিদে রশীদের সামনে আখের রস বিক্রি হয়। সর্বশেষ আখগুলো মাড়াই হচ্ছিল। আমি অর্ডার করলাম। ততোক্ষণে হুযূর যিয়ারত শেষ করে হুইল চেয়ারে কাফেলা সমেত ফিরছেন। রসের দোকান অতিক্রমের সময় হুযূর খাদেমদেরকে বললেন, দু-গ্লাস রস নিয়ে আয় তো বেটা! খাদেম এসে দেখল গ্লাসে সর্বশেষ রসটুকু আমার জন্য পরিবেশন করা হয়েছে। হুযূরকে জানানো হলো। হুযূর কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বললেন, ঐটাই নিয়ে আয় না! আমি এদিকে তার আগেই গ্লাসের রস প্যাক করে হুযূরের কাছে নিয়ে যাচ্ছিলাম। হুযূরের এই সরলতা ও অকৃত্রিমতায় আমার চোখ তখন ভিজে উঠেছিল। হুযূর আমাদেরকে নিজের ছেলের চেয়েও বেশি মনে করতেন। এ কারণেই এতো বড় একজন মানুষ এতো সাধারণ একটি বিষয়ে জড়াতে পেরেছেন নিজেকে। মানুষ অসাধারণ তখনই হয়, যখন উন্নত স্তরে থেকেও সাধারণ বিষয়ে অবীললায় জড়িয়ে যেতে পারেন।

হুযূর অনেক উদার ও মমতাময় ছিলেন। বাংলাদেশী ছাত্রদের খুব খোঁজ-খবর রাখতেন। তাদের ভর্তিসংক্রান্ত কোন জটিলতার সৃষ্টি হলে হুযূর পাশে দাঁড়াতেন।

উস্তাযে মুহতারামের সর্বশেষ নিঃশ্বাস

একান্ত খাদেমের বক্তব্য অনুযায়ী, ইন্তিকালের কয়েক ঘণ্টা আগেও হুযূর পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। আসর নামাযের পর তার পুত্রের ফোন আসে। হযরত পুত্রকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, আমি পরিপূর্ণ সুস্থ, পেরেশানীর কোন কারণ নেই। মাগরিবের নামায আদায়ের পর মা'মূল অনুযায়ী খাদেমকে দিয়ে সেহেরের দু'আ পড়াচ্ছিলেন আর দম করাচ্ছিলেন। দমের সময় খাদেম দু'আর একটি জায়গায় ভুল করে ফেলে। কিন্তু হুযূর কোন কারণে লোকমা দিতে চেয়েও পারেননি। তারপর হঠাৎ তবিয়ত ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছিল। অগত্যা হাসপাতালে নেয়া হয় এবং সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে রব্বে কারীমের ডাকে সাড়া দেন। আল্লাহ তা'আর তার কবরকে নূর দ্বারা ভরে দিন। আমীন।

লেখক : শিক্ষার্থী, ইফতা বিভাগ,
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

(৩০ পৃষ্ঠার পর; সুন্নাহ-সম্মত পোশাক)

মোটকথা কোনভাবেই যেন মুসলিমগণ অমুসলিমদের সঙ্গে একাকার না হয়ে যায়, সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, মুসলমান স্বতন্ত্রজাতি; লেবাস পোশাকে তা প্রকাশ পেতে হবে।

তৃতীয় মূলনীতি : নারীদের পোশাক পুরুষদের পোশাক-সদৃশ না হওয়া আর পুরুষদের পোশাক নারীদের পোশাক-সদৃশ না হওয়া।

আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন ঐ পুরুষকে যে মহিলার পোশাক পরে এবং ঐ মহিলাকে যে পুরুষের পোশাক পরে। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪০৯৮, মুসনাদে আহমাদ ২/৩২৫)

সমাজে যে পোশাক পুরুষের পোশাক হিসেবে পরিচিত বা পুরুষেরা যে ধরণ বা ডিজাইনের পোশাক পরিধান করে, মহিলারা তা পরিধান করবে না। অনুরূপ মহিলাদের জন্য পরিচিত পোশাক বা ডিজাইন, রঙ, কাটিং পুরুষেরা ব্যবহার করবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال অর্থাৎ যে নারী পুরুষদের অনুকরণে সাজসজ্জা করে আর যে পুরুষ নারীদের অনুকরণে সাজসজ্জা করে তারা আমাদের (মুসলিম সমাজের) মধ্যে গণ্য নয়।[৭]

সুতরাং পুরুষের জন্য নারীদের পোশাক পরিধান করা হারাম। অনুরূপ কোন নারীর জন্য পুরুষের মতো পোশাক পরিধান করা হারাম। কিন্তু আফসোসের বিষয়, বর্তমানে মেয়েরা এ বিষয়ের কোন তোয়াক্কাই করছে না। আধুনিক হওয়ার প্রতিযোগিতায় আজকাল মেয়েরা প্যান্ট, শার্ট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

চতুর্থ মূলনীতি : পুরুষদের জন্য টাখনু ঢেকে যায় এমন পোশাক পরিধান করা হারাম।

স্বাভাবিকভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় উপর হতে ঝুলন্ত পোশাক যা দ্বারা পায়ের টাখনু ঢেকে যায় এমন পোশাক পরা যাবে না। চাই তা প্যান্ট হোক, লুঙ্গি-পাজামা হোক বা জুব্বা হোক। জাহেলী যুগে অহঙ্কারী লোকেরা মাটিতে কাপড় হেঁচড়ে চলত। আমাদের সমাজের অনেকেই প্যান্ট, লুঙ্গি ইত্যাদি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরে থাকেন। অহঙ্কারবশত হলে তো এটি মারাত্মক কবীরা গুনাহ আর শুধু অভ্যাস বা রেওয়াজের কারণে হলেও তা নাজায়েয এবং সর্বাবস্থায় পরিতাজ্য।

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ما أسفل من الكعبين من الإزار ففى النار লুঙ্গির যে অংশ টাখনুর নিচে যাবে তা অর্থাৎ টাখনুর নিচের সে স্থান জাহান্নামে জ্বলবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৪৫০, সুনানে নাসায়ী; হা.নং ৫৩৩০)

অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশত মাটিতে কাপড় হেঁচড়ে চলে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। অর্থাৎ তার উপর রাগান্বিত থাকবেন, রহমতের দৃষ্টি দেবেন না। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৪৬৫, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২০৮৫, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৪৮৮৪, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪০৮৫, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৭৩০, ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন হাদীসটি হাসান সহীহ, সুনানে নাসায়ী; হা.নং ৫৩২৮, সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৩৫৬৯, আব্দুর রায্যাক ফিল জামে' মা'মার সূত্রে; হা.নং ১৯৯৮৪, তাবারানী কাবীর; হা.নং ১৩১৭৮, ওয়াল আওসাত; হা.নং ১৪৭৭)

হযরত উমর ফারূক রাযি. এক ব্যক্তিকে টাখনুর নিচে লুঙ্গি পরতে দেখে তাকে তিরস্কার করলেন। এরপর একটি ছুরি দিয়ে লুঙ্গির নিচের অংশ কেটে দিলেন।[৮] বলা বাহুল্য, পোশাক মানুষের দেহকে আবৃত করে রাখে এবং তার অভ্যন্তরীণ

---

৭. মুসনাদে আহমাদ ২/১৯৯ মুহাক্কিক শুআইব আরনাউত দা.বা. বলেন, مرفوعه صحيح আল্লামা হাইসামী রহ. বলেন, رواه أحمد، والهذلى لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، ورواه الطبرانى باختصار، وأسقط الهذلى المبهم فعلى هذا رجال الطبرانى كلهم ثقات. মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/১০৩।

৮. হাদীসটির আরবী ইবারত নিম্নরূপ- عن خرشة : أن عمر دعا بشفرة فرفع إزار رجل عن كعبيه ثم قطع ما كان أسفل من ذلك দেখুন মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ২৪৮২৯।

অনুভূতিগুলো নিয়ন্ত্রিত ও পরিশীলিত করে। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন পোশাক পরিধানের নির্দেশ দিয়েছেন যা বিনয় ও সরলতার প্রকাশক এবং অহমিকা প্রকাশের বিপরীত। আর যে পোশাকে অহমিকা, গর্ব, অহঙ্কার ইত্যাদি আত্মবিরোধী অনুভূতি জাগ্রত হয় সেগুলোকে নীতিগতভাবেই কঠিন হারাম ঘোষণা করেছেন। বর্তমানে অনেকেই এ অভিশপ্ত কাজটি করে যাচ্ছে। আবার কেউ কেউ অমুসলিম সংস্কৃতিতে প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন যুক্তিও পেশ করে থাকে। যেমন বলে, অহঙ্কার করে পোশাক টাখনুর উপর ঝুলিয়ে দিলে তা অন্যায়, কিন্তু অহঙ্কার ছাড়া কেউ এরূপ করলে দোষ নেই। প্রশ্ন হলো, অহঙ্কার না থাকলে পোশাক টাখনুর নিচে নামানোর প্রয়োজনটা কি?

এর উত্তর হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মতো টাখনু পর্যন্ত প্যান্ট, পোশাক পরিধান করলে দেখতে খারাপ দেখায়, সেকেলে মনে হয় বা স্মার্টনেস পরিপূর্ণ হয় না। কিন্তু কথা হল 'স্মার্ট দেখানো', সেকেলে দেখানো থেকে রক্ষা পাওয়া ইত্যাদি অনুভূতির নামই অহমিকা বা অহঙ্কার। অতএব ইচ্ছাকৃতভাবে যারা নিজের পাজামা, প্যান্ট, লুঙ্গি ইত্যাদি টাখনু আবৃত করে তৈরি করেন বা পরেন তারা নিঃসন্দেহে অহমিকার কারণেই পোশাক নিচু করে পরিধান করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. এক ব্যক্তিকে টাখনুর নীচে কাপড় পরতে দেখে বললেন, যে ব্যক্তি টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে নামায পড়ে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবেন না। (মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক; হা.নং ৩৬৩৫)

পঞ্চম মূলনীতি : পুরুষদের জন্য রেশমী পোশাক না হওয়া।

إن هذين حرام على ذكور أمتى حل لإناثهم يعنى الذهب والحرير

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের পুরুষের জন্য রেশমের পোশাক ও স্বর্ণ হারাম করা হয়েছে। আর তা হালাল করা হয়েছে নারীদের জন্য।[9]

অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা রেশমের কাপড় পরিধান করো না। কেননা, যে ব্যক্তি (পুরুষ) দুনিয়াতে রেশম পরিধান করবে সে আখেরাতে তা হতে বঞ্চিত হবে।[10]

মূলত পুরুষের পোশাক পুরুষোচিত আর নারীর পোশাক নারীর উপযোগী হওয়াই শরীয়তের দৃষ্টিতে কাম্য। স্বভাবগতভাবেই পুরুষকে শক্তি ও দৃঢ়তা দেয়া হয়েছে। কারণ, তার কর্মক্ষেত্র ঘরের বাইরের জগত। তাই কোমল পোশাক, বর্ণিল সাজসজ্জা, পুরুষ-প্রকৃতি ও তার দায়িত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পক্ষান্তরে নারীকে আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন কোমলতা ও কমনীয়তা। পোশাকের ক্ষেত্রেও শরীয়তের নির্দেশনা তার প্রকৃতির সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

লেখক : মুফতী ও মুহাদ্দিস, মাদরাসা বাইতুল উলূম ঢালকানগর, গেন্ডারিয়া, ঢাকা

৯. বিভিন্ন শব্দে অসংখ্য হাদীসের কিতাবে এ অর্থের বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। উপরোল্লিখিত হাদীসটি দুইজন সাহাবী থেকে বর্ণিত। এক. হযরত আলী রা. দুই. হযরত ইবনে আমর রা.। আলী রা. এর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন: মুসনাদে আহমদ; হা.নং ৭৫০, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪০৫৭, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৭২০, সুনানে নাসায়ী; হা.নং ৫১৪৪, সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৩৫৯৫, সুনানে বায়হাকী; হা.নং ৪০১৯, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ২৪৬৫৯, মুসনাদে বায্যার; হা.নং ৮৮৬, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা; হা.নং ২৭২, সহীহ ইবনে হিব্বান; হা.নং ৫৪৩৪।

ইবনে আমর রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন: সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৩৫৯৭, মুসনাদে আবূ দাউদ ত্বয়ালিসী; হা.নং ২২৫৩, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ২৪৬৬২।

১০. এই হাদীসটিও দু'জন সাহাবী থেকে বর্ণিত। (এক) উমর রা. (দুই) আনাস রা.। উমর রা. এর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন: সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৪৯৬, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২০৬৯, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৮১৭, সুনানে নাসায়ী; হা.নং ৫৩০৬, মুসনাদে আহমদ; হা.নং ২৫১, আবূ আওয়ানাহ; হা.নং ৮৫১১।

আনাস রাযি. এর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন: সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৪৯৪, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২০৭৩, মুসনাদে আহমদ; হা.নং ১২০০৪, নাসায়ী ফিলকুবরা ৫/৪৬৫, সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৩৫৮৮।

(৩৩ পৃষ্ঠার পর; আধুনিক সাজসজ্জা)

হাই হিল (Heel Shoes)

শরীয়তের দৃষ্টিতে হাই হিল বা পেন্সিল হিল জুতা পরিধান করা নাজায়েয। কারণ এর দ্বারা মহিলার সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়ে যায়। তার পদশব্দ অন্যরা শুনতে পায়। অথচ কুরআনে মাজীদে মহিলাকে সৌন্দর্য আবৃত করার, নিঃশব্দে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (সূরা নূর- ৩১)

অপরদিকে ডাক্তারদের মতে হাই হিল ব্যবহারে শারীরিক বহু ক্ষতি রয়েছে। উপরন্তু এটা অমুসলিমদের সাজ।

প্রিয় পাঠক! 'চশমার আয়না যেমন' কথাটি শতভাগ বাস্তব। ইসলামের ক্ষেত্রেও তা-ই, ভাল চোখে দেখলে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আর বাকা চোখে দেখলে ইসলাম তো দূরে থাক, বাড়ির উঠোনটাও বাঁকা দেখাবে। তাই চশমার আয়নাটা স্বচ্ছ হওয়া খুবই জরুরী। বিশেষত আলোচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে।

আজ ইসলামের উল্লিখিত মূলনীতিগুলো না মানার কারণে কত নারী যে ধর্ষণের শিকার, এসিডে দগ্ধ এবং সদ্য ঘটে যাওয়া খাদিজার মত চাপাতির অসংখ্য কোপের শিকার। এসব কেন ঘটে? কী এর কারণ? কেন ঐ ছেলের তার প্রতি এত আকর্ষণ ও অভিমান। ধর্ষণ, হত্যা ইত্যাদি নিঃসন্দেহে দণ্ডনীয় অপরাধ এবং আমরা এর যথোপযুক্ত শাস্তিও চাই। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছেন এর মূল কারণ? পত্রিকায় প্রকাশ, তাদের মাঝে পূর্ব থেকেই অ্যাফেয়ার চলছিল। পরবর্তীতে ব্রেকআপের পরিণতিতে এই অঘটন। এর মূল কারণ ইসলামী আইন লঙ্ঘন তথা নিষিদ্ধ সম্পর্ক। তথা অবাধ মেলামেশা ও একে অপরকে আকর্ষণের বিভিন্ন টিপস।

আফসোস! আজ গণমাধ্যমেও টিপসের ছড়াছড়ি। একবার রেডিওতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মনোবিজ্ঞানীকে এক মেয়ের প্রশ্ন ছিল, 'আমার বন্ধুরা আমাকে পাত্তা দেয় না, কি করতে পারি?' মনোবিজ্ঞারীর উত্তর ছিল, 'তুমি বিভিন্ন সাজে নিজেকে সাজিয়ে তুলো। চলমান সাজের অনুসরণ করো। তোমার গ্ল্যামার দেখলে তখন তারা তোমার মূল্যায়ন করতে বাধ্য হবে।' নাউযুবিল্লাহ। একজন মুসলিম নামধারী শিক্ষিকা কীভাবে এমন অরুচিকর পরামর্শ দিতে পারলেন তা কল্পনা করতেই আমরা হতবুদ্ধি হয়ে যাই। কিন্তু এটাই আজকের চরম বাস্তবতা। পদ্মা যে আজ উল্টো পথে বইছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে অবৈধ ও বিজাতীয় সকল সাজসজ্জা পরিহার করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক : শিক্ষক, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া; খতীব, বায়তুর রহমান জামে মসজিদ, ৭ নম্বর সেক্টর, উত্তরা, ঢাকা

কাফেলা এবার ফেনীর পথে

মাওলানা আব্দুল হান্নান

হঠাৎ গাড়ির তীব্র ঝাঁকুনিতে তন্দ্রা উবে গেল। মাথা ঝাড়া দিয়ে দেখি, সবার চোখ বাঁ-দিকের জানালায়। তাদের দৃষ্টি লক্ষ্য করে আমিও তাকাই। দূরের সবুজাভ পাহাড়সারি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে আসছে। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে অস্পষ্ট রেখায় কাঁটাতারের বেড়া; ভিন্নতার প্রতীক দু-দেশের সীমানা-বেষ্টনী।

সেই ক-খ-ন আবছা আধারে ঢাকা ছেড়েছি। একটু পর কুমিল্লা পেরোব। সামনে ফেনীর সীমানা, কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য। এতোক্ষণে মিষ্টি রোদ জানালার কাঁচ গলে শরীর ছুঁয়েছে। রোদের উষ্ণতায় ওম ধরেছে মনেরও আঙিনায়।

মাওলানা নজরুল ইসলাম– সফরের স্থানীয় আয়োজক– ফেনীর প্রবেশপথে স্বাগত জানাতে অপেক্ষমাণ। একটু পরপর ফোন করে জিজ্ঞেস করেন– আপনারা কোথায়, কতদূর?। শেষবার 'এই তো আরেকটু' বলতে না বলতেই পথের পাশে দাঁড় করানো সাদা প্রাইভেটকারটি চোখে পড়ল; পাশে দাঁড়িয়ে প্রিয় মাওলানা নজরুল ইসলাম। মূলত তাঁরই একান্ত আগ্রহ ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় রাবেতা-কাফেলা এবার ফেনীর দোরগোড়ায় উপস্থিত। দেশব্যাপী সফর উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় এটা রাবেতার চতুর্থ সফর।

ফেনীর প্রথম মঞ্জিল

জামি'আ ইসলামিয়া দত্তাসার মাদরাসা। ফেনীর প্রবেশ-পথে হাইওয়ে-সংলগ্ন অনেক পুরনো একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা। এ পর্যন্ত সাতজন মুহতামিম গত হয়েছেন। বর্তমান মুহতামিম মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব। হালকা গড়ন, হাস্যোজ্জ্বল চেহারার মধ্যবয়সী আলেমে দীন। ৩২জন উস্তাদ আর ৪৫০জন ছাত্র নিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

আমরা মাদরাসা-ভবনের দ্বিতীয় তলায় অফিসকক্ষে বসেছি। একে একে উস্তাদগণও চলে এলেন। মাওলানা নজরুল ইসলাম সফররত সকলের পরিচয় তুলে ধরলেন। রাবেতার মজলিসে শূরার সদস্য ও রাহমানিয়ার নায়িবে মুহতামিম মুফতী ইবরাহীম হিলাল সাহেব সংক্ষেপে সফরের উদ্দেশ্য তুলে ধরলেন– জামি'আ রাহমানিয়ার আসাতিযায়ে কেরাম তাদের ফাযেলদের সমন্বয়ে 'রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়া' নামে একটি ফুযালা পরিষদ গঠন করেছেন। আসাতিযায়ে কেরামের সার্বিক তত্ত্বাবধানে আত্মসংশোধন, ব্যক্তিগঠন, দীনী সমাজ বিনির্মাণ ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে এর প্রতিষ্ঠা। রাহমানিয়ার দরস বন্ধ থাকাকালীন আমরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে খিদমতরত ফুযালায়ে কেরামের খোঁজ-খবর নিয়ে তাদের হিম্মত বাড়ানোর চেষ্টা করে থাকি। পাশাপাশি কওমী মাদরাসাগুলোর হালাত সম্পর্কে অবগতি লাভ, বুযুর্গ উলামায়ে কেরামের নেক সোহবত, পারস্পরিক মতবিনিময় ও দু'আ কামনাও আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য থাকে। আমাদের আজকের এ সফরও সে ধারাবাহিকতার একটি প্রয়াস।

উপস্থিত সকলেই হুযূরের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। কথা শেষে একজন প্রবীণ উস্তাদ মন্তব্য করলেন, চমৎকার উদ্যোগ; দেশের প্রতিটি জামি'আর জন্য অনুসরণীয়।

হুযূরের বয়ান শেষে মাওলানা শফীক সালমান কাশিয়ানী অগ্রসর হলেন। রাহমানিয়ার নবীন উস্তাদ। রাবেতার জন্য নিবেদিতপ্রাণ। তিনি উপস্থিতিদের হাতে দ্বি-মাসিক রাবেতার মে-জুন সংখ্যাটি তুলে দিলেন। আবেগময় ভাষায় সবাইকে রাবেতায় লিখতে উদ্বুদ্ধ করলেন। আসলে সবার হাতে হাতে রাবেতা পৌঁছে দেয়া এবং রাবেতায় লেখালেখির আহ্বান জানানোও সফরের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য। রাবেতা কর্মীগণ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এসব কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। সবাই যখন পরম আগ্রহ নিয়ে রাবেতা দেখছে, আমরা তখন সদ্য পেড়ে আনা কচিডাবে হাবুডুবু খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম ।

সোলতানিয়ার সুলতানের দরবারে

জামি'আ হুসাইনিয়া মহীপাল মাদরাসা শহরের প্রাণকেন্দ্রে গড়ে ওঠা ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের একটি প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রীয় দায়িত্বে আছেন আল্লামা যমীরুদ্দীন রহ. এর খলীফা মাওলানা ফযলুল হক সাহেব। তিনি হজ্জের সফরে থাকায় নায়িবে মুহতামিম সাহেব আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। এখানে তলাবাদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত নসীহত হয়। অতঃপর আমরা লালপোল সোলতানিয়ার পথে বেরিয়ে পড়ি।

দুপুর ১টা বেজে ১০ মিনিট। সোলতানিয়ার সুলতান হাকীমুল উলামা খ্যাত মুফতী সাঈদ আহমাদ দা.বা. তখন গভীর মুতালা'আয় নিমগ্ন। হালকা পায়ে আমরা হযরতের দরবারে উপস্থিত হলাম। তার প্রভাবব্যঞ্জক স্বভাব-গাম্ভীর্যের কথা আগেই শুনেছি । ইলমী গভীরতাও সর্বজন সমাদৃত। ফেনীর প্রথম সারির প্রতাপশালী একজন বুযুর্গ আলেম। আমাদেরকে দেখে খাস কামরা থেকে সাক্ষাত-কামরায় চলে আসলেন। সকলকে মুসাফাহার বরকতে ধন্য করলেন। হযরতকে বার্ধক্য পেয়ে বসেছে। চলাফেরা, নামায ইত্যাদি সবই হুইল চেয়ারের সাহায্যে সম্পন্ন হয়। চেয়ারে বসেই কুশল-বিনিময় করলেন। প্রথমেই রাহমানিয়ার মুহতামিম হযরত মুমিনপুরী হুযূরের সিহ্হতের কথা জানতে চাইলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. এর স্বাস্থ্যের অবস্থা। আমীরে সফর, রাহমানিয়ার শাইখে সানী মাওলানা আব্দুর রায্যাক মানিকগঞ্জী দা.বা. মুরুব্বীদ্বয়ের হালাত জানালেন এবং আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্যগত অপারগতায় তার আসতে পারেননি সে কথাও তুলে ধরলেন। কথাটি শুনে তিনি

আফসোস করে বললেন, তাঁরা তাশরীফ আনলে খুবই ভালো হতো। আপনারা আমার সালাম পৌঁছে দিবেন। তারপর নিজের লিখিত কিতাবের সবগুলো কপি মুহতামিম সাহেবের জন্যে হাদিয়াও পাঠিয়ে দিলেন।

আমরা হযরতের যবান থেকেই জানতে পারলাম লালপোল মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। তার শাইখ ছিলেন কুতবুল আলম শাহ সোলতান আহমাদ নানুপুরী রহ.। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে 'ইফতা' না পড়া সত্ত্বেও শাইখ তাকে ঐতিহ্যবাহী নানুপুর জামি'আ ওবাইদিয়ার প্রধান মুফতীর দায়িত্ব প্রদান করেন এবং হযরতের হায়াত পর্যন্ত সেখানে থাকার আদেশ করেন। নানুপুর থাকা অবস্থায় তিনি লালপোলে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। তিনি এসে উদ্বোধনও করে যান। সেই লালপোল মাদরাসা আজ একটি জামি'আয় পরিণত হয়েছে। দীনের প্রায় সব লাইনের খিদমত যথার্থভাবে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলছিলেন, হযরতের দু'আর বরকতে আমি এতো বেশি পরিমাণ দীনী সফর করতে পেরেছি যে, বাংলার পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ কোন প্রান্তই আমার অদেখা নেই। এখন আমি বার্ধক্যের কাছে পরাজিত। শুধু দরস আর তাসনীফাতের কাজই করতে পারছি। তারপর পাশের কিতাবের তাকে ইশারা করে নিজের লেখা কিতাবগুলোর পরিচয় তুলে ধরেন। এ পর্যায়ে হযরতকে রাবেতায়ও কিছু লিখতে দরখাস্ত পেশ করা হয়। তিনি বললেন, রাবেতা তো রাবেতাই। এর মাধ্যমে সবার সঙ্গে রবত হবে; দৃঢ় বন্ধন তৈরি হবে, আমি আর কী লিখব? তারপর অনুরোধ করায় তিনি আমাদেরকে কিছু নসীহত করেন। দস্তরখানে তখন দুপুরের খাবার প্রস্তুত।

যোহরের নামায শেষ হল। ছাত্র উস্তাদগণের উদ্দেশ্যে হযরত মানিকগঞ্জী হুযূর গুরুত্বপূর্ণ নসীহত পেশ করলেন। হুযূরের বয়ানে হাকীমুল উলামা সন্তুষ্টি প্রকাশ করে সকর তালিবে ইলমকে বললেন, হুযূরের প্রতিটি কথা ও নসীহত স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত। তোমরা যদি এগুলো মেনে চলতে পারো, ইনশাআল্লাহ সফলতা তোমাদের পদচুম্বন করবেই।

ইলমী সওদার খোঁজে উলামাবাজারে

প্রচণ্ড উত্তাপ ছড়িয়ে দুপুরের সূর্য তখন পরিশ্রান্ত। আকাশের শান্ত ছায়া যমীনে নেমে এসেছে। প্রকৃতির নীরবতা ছাপিয়ে প্রায় পনের মাইল দূরে আমরা একটি নির্জন গ্রামে পৌঁছলাম। কদমতলা মাদীনাতুল উলূম মাদরাসা সোনাগাজীর ভোয়াগ গ্রামে অবস্থিত। দেড় একর জমিতে সবুজের সমারোহে সুন্দর একটি প্রতিষ্ঠান। মাদরাসার বারান্দায় পা রাখতেই একজন উস্তাদ দ্রুত এগিয়ে এলেন। অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে আমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। চুপিসারে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই! মুফতী মনসূরুল হক সাহেব আসেননি? আমি না-সূচক উত্তর দিলাম। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, তিনি আশাহত হলেন। বললেন, হুযূরের লেখার আমি একান্ত ভক্ত। হুযূরের কিতাব যতই পড়ি মুগ্ধ হই। অন্তরে হুযূরের মহব্বত জায়গা করে নিয়েছে। হুযূরকে দেখা আমার স্বপ্ন ছিল; আশা করেছিলাম, আজ তা পূরণ হবে। আফসোস! আজো আমি বঞ্চিত হলাম। জানি না, সে স্বপ্ন আমার কবে পূরণ হবে। ভাই! আপনি শুনলে অবাক হবেন, মুফতী সাহেব হুযূরের নামে আমার একমাত্র ভাগ্নের নাম 'মনসূরুল হক' রেখেছি।

তার কথাগুলো আমার হৃদয় স্পর্শ করল। আমি বিস্মিত হলাম। এই দূরপ্রান্তের অচেনা ভক্তের না দেখা ভালোবাসা যদি এতোটা গভীর এবং স্বচ্ছ হয় তাহলে সর্বক্ষণ কাছে থাকা মানুষগুলো হুযূরের মহব্বতে না জানি কতোটা আপ্লুত হয়!

উস্তাদ আর ছাত্রদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাত ও নসীহতের মধ্য দিয়ে আমাদের এখানকার কার্যক্রম শেষ হল। আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য ছিল আসরের নামায উলামাবাজার পৌঁছে আদায় করবো। আলহামদুলিল্লাহ, যথাসময়ে আমরা উলূমে নববীর সে ঈর্ষণীয় কাননে পৌঁছে যাই।

মাদরাসা ক্যাম্পাসের বাহির থেকেই আযানের সুমধুর ধ্বনি কানে বাজল। ছাত্ররা ছাত্রাবাস থেকে বেরিয়ে মসজিদে আসছে। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। সাদা লেবাসের শুভ্রতায় মসজিদমুখী গলিপথগুলো তখন ঝলমল করছে। যেন খণ্ড খণ্ড তুষার শুভ্রতা ছড়াচ্ছে। আমরা যখন মাদরাসা চত্বর পেরিয়ে সেই আলোকিত মিছিলে শরীক হলাম তখন নায়েবে নবীদের নিষ্পাপ চেহারাগুলো খুশির আভায় চকচক করছে আর ক্ষণেক্ষণে চারদিক থেকে পবিত্র কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে– আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ। সে সালামে শ্রদ্ধা আর আনন্দের তৃপ্তি ঝরে পড়ছে। স্বাগত আর অভ্যর্থনার ভালোবাসা ফুটে উঠছে। মনে হল, এ বাজারের সওদা খুবই কিমতী ও উমদা। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে এসব সওদা পরম আগ্রহে গৃহীত ও সমাদৃত হবে।

আসরের নামায শেষ হল। বাদ আসর উলামাবাজারের আসাতিযায়ে কেরাম, দুই হাজার ছাত্র ও মহল্লার কিছু মুসল্লিয়ানে কেরামের উপস্থিতিতে শাইখে সানী সংক্ষিপ্ত অথচ খুবই মূল্যবান আলোচনা পেশ করেন।

মসজিদের পাশেই মাকবারায়ে হালীমিয়া। পীরে কামেল মাওলানা আব্দুল হালীম রহ. সহ আরো কয়েকজন মহান বুযুর্গ এখানে শায়িত। সদ্য শায়িত হয়েছেন ফেনী জেলার এক ক্ষণজন্মা মনীষী মুহাদ্দিস হুযূর নামে প্রসিদ্ধ মাওলানা আহমাদ কারীম রহ.। এইতো গত ২৬ আগস্ট ২০১৬ইং থেকে আমরা তাকে 'রহমাতুল্লাহি আলাইহি' বলতে শুরু করেছি। তিনি একনাগাড়ে ৫৬ বছর সহীহ বুখারীর দরস দান করেছেন। জীবনের ৬০টি বসন্ত এখানেই তিনি জীবিতাবস্থায় কাটিয়েছেন। তাকে হারিয়ে গোটা ফেনীর উলামা সমাজে শোকাচ্ছন্ন পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। এই ক্ষণজন্মা মনীষীর অন্তর্ধানে প্রতিটি তালিবে ইলম, নায়েবে নবী হারিয়েছেন একজন প্রকৃত সাধক, দক্ষ উস্তাদ ও দরদী অভিভাবক। মাত্র ৮৭ বছরের এই সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি ইলমী জগতে রেখে গেছেন এক অবিস্মরণীয় অবদান। তিনি তার কারনামায় বেঁচে থাকবেন কাল হতে কালান্তরে লক্ষ মানুষের হৃদয় থেকে হৃদয়ে। আমরা মাকবারায়ে হালীমিয়াতে রূহের মাগফিরাত কামনায় কিছুক্ষণ অবস্থান করি। প্রভুর দরবারে মরহুম মুরব্বীগণের জান্নাতে উচ্চাসন কামনা করে মাদরাসা অফিসে চলে আসি।

উলামাবাজারের একটি প্রাচীন বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম আল-হুসাইনিয়া। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে এর প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠাকালীন

মুহতামিম মাওলানা ফযলুল হক বাকী রহ.। বর্তমান মুহতামিম হারদুঈ রহ. এর অন্যতম খলীফা হযরত সাইয়েদ আহমাদ দা.বা.। বয়োজ্যেষ্ঠ এই বুযুর্গ আলেম খাটিয়ায় শুয়ে তাসবীহ পড়ছিলেন। দেখে মনে হল সর্বদাই এ যবান রবের স্মরণে সতেজ ও তাজা থাকে। আমরা মুসাফাহার বরকত লাভ করে হযরতের হাতে 'রাবেতা' তুলে দিয়ে দু'আর দরখাস্ত করলাম। তিনি আমরা চলে আসা পর্যন্ত খুব মনোযোগ দিয়ে রাবেতা খুলে খুলে দেখছিলেন। মনে হল এসব মহান ব্যক্তিগণের ক্ষণিকের এই শুভদৃষ্টির বরকতে রাবেতা টিকে থাকবে অনন্তকাল।

উল্লেখ্য, এই মহান বুযুর্গ এখন আর বেঁচে নেই। গত ৪ ডিসেম্বর ২০১৬ইং রোজ রবিবার প্রিয়তম প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে ইহকালীন সফর সমাপ্ত করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জান্নাতে হযরতের মাকাম বুলন্দ করে দিন। আমীন।

সময়ের স্বল্পতায় খানকা ও বিশাল ক্যাম্পাস ঘুরে দেখা এবং তথ্য সংগ্রহ কিছুই সম্ভব হয়নি। বারবার অস্থিরতা প্রকাশ করছি। সফরসাথী মাওলানা ইমদাদুল্লাহ (মুদাররিস, বাইতুল আমান মিনার মসজিদ ও মাদরাসা কমপ্লেক্স) আরবীয় গড়নের এক খুবসূরত যুবকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। যিনি অত্র প্রতিষ্ঠানের মেহনতী উস্তাদ এবং বর্তমান মুহতামিম সাহেবের দৌহিত্র। দেখতেও যেমন ইলমেও তেমন। নাম মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ। তাকে বলা মাত্রই আল-উলামা স্মারকসহ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পুস্তিকা আমাদের হাদিয়া করলেন। তার কাছেই জানতে পারি অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাসচিব 'আদীব সাহেব' নামে খ্যাত মাওলানা নূরুল ইসলাম সাহেবের কথা। মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব আমাদেরকে নিয়ে গেলেন মেহমানখানায়। সেখানে তখন প্রস্তুত ছিল বৈকালিন নাস্তার শাহী দস্তরখান। ভিন্ন ভিন্ন পাত্রের বিশাল সমারোহে লোভনীয় আয়োজন। আনার, আঙ্গুর, পেস্তা, যাইতুন, আম, আপেল, দই, কফি কিছুই বাদ পড়েনি। বাহ্যত মনে হবে কোন আয়েশী পরিবেশন। মূলত এ ছিল উলামায়ে কেরামের সম্মানে উলামাবাজার মাদরাসার শ্রদ্ধা নিবেদন। আরবীয় আপ্যায়নের নমুনা প্রদর্শন। সে আন্তরিকতায় আমরা খুবই মুগ্ধ হই।

হালীমিয়া থেকে চৌমুহনী ইসলামিয়া

পরবর্তী মঞ্জিল সোনাগাজীর তা'লীমুদ্দীন হালীমিয়া মাদরাসা। বিশাল মাঠকেন্দ্রিক তিনদিক-ঘেরা দোতলা ভবনের চমৎকার একটি প্রতিষ্ঠান। ৩০জন উস্তাদ আর ৭৫০জন ছাত্রের দায়িত্ব নিয়ে মাওলানা আতাউল্লাহ দা.বা. বেশ সুনামের সাথেই মাদরাসাটি পরিচালনা করছেন। আমাদেরকে যথেষ্ট কদর ও সম্মান করলেন। রাবেতা সদস্যগণ এখানেও সারাদিনের ক্লান্তি মাথায় নিয়ে নিজেদের কর্তব্য পালন করেছেন। নায়েবে মুহতামিম সাহেবের সংক্ষিপ্ত বয়ান শেষে আমরা ছুটে চলি বালুয়া চৌমুহনী ইসলামিয়া মাদরাসার পানে। মুহতামিম সাহেবের ভাষ্য অনুযায়ী ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে এর প্রতিষ্ঠা। তারপর সময়ের ব্যবধানে বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আজ মিশকাত পর্যন্ত একটি প্রতিষ্ঠানের রূপ ধারণ করেছে। মুহতামিম মাওলানা আবূ তাহের সাহেব বেশ মিশুক প্রকৃতির। সামান্য সময়ে বেশ সখ্যতা গড়ে উঠেছে। এখানে তিনি ১৮ বছর যাবত খিদমত করছেন। আমাদেরকে তিনি নিয়ে গেলেন একটি জলাশয়ের কাছে। বললেন, জায়গাটি মাদরাসার বেশ প্রয়োজন। দু'আ করবেন, আল্লাহ যেন ব্যবস্থা করে দেন। বলার আন্তরিকতায় মনে হল আল্লাহ এ তামান্না অবশ্যই কবুল করবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকলের নেক প্রয়োজনগুলো পূরণ করে দিন। বিশেষত আমাদের এ জাতীয় খোদায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর। আমীন।

পাহালিয়ার তীরে জীবন্ত রশীদিয়া

আমরা এখন ফেনী শহরের পাঁচ কিলো পূর্বে কালিদাস পাহালিয়া নদীর তীরে। আমাদের সামনে জামি'আ রশীদিয়ার অনিন্দ্যসুন্দর বিশাল ক্যাম্পাস। মাঠের পাশে আধুনিক স্থাপত্যে গড়ে ওঠা দৃষ্টিনন্দন ছাত্রাবাস আর সৌন্দর্য্যের প্রতীক আর-রশীদ জামে মসজিদ। চারপাশে বিচিত্র ফুলের সাজানো বাগান আর অজানা ফলের অসংখ্য বৃক্ষ। প্রত্যেক ভবন থেকে বেরিয়ে গেছে পিচঢালা ছোট ছোট পথ। একপাশে স্বচ্ছ জলাধার। অন্যদিকে বয়ে চলা পাহালিয়া নামের শান্ত নদী। প্রকৃতির অসাধারণ লীলা-বৈচিত্র্যের বর্ণিল সমাহার এখানে। বসন্তের প্রথম ফুলের চেয়েও বেশি সজীব ও প্রাণবন্ত। রাতের রশীদিয়া বড়ই চমৎকার।

ছাত্রাবাসের বেলকনি থেকে চোখে পড়ে আলো আঁধারির এক অপূর্ব পরিবেশ। আকাশের সন্ধ্যা যখন যমীনে নেমে আসে রশীদিয়া তখন হয়ে ওঠে হাজার হাজার মুখরিত পাখির অভয়াশ্রম। সন্ধ্যা যত গাঢ় হয় কিচিরমিচির তত স্তিমিত হতে থাকে। একসময় প্রতিটি পাখি শাখায় শাখায় পাতার ছাউনিতে ঘুমিয়ে পড়ে একেবারেই হাতের নাগালে। ইচ্ছা করলেই ধরা যাবে। কিন্তু বড় আজব ব্যাপার! জামি'আ রশীদিয়ার চার হাজার ছাত্র প্রত্যেকেই নিজের চেয়ে সেসব পাখিদের বেশি ভালোবাসে। আপন করে হৃদয়ের মমতা মিশিয়ে ওরা কৃত্রিম বাসাও বানিয়ে রাখে। পাখিরাও সে ভালোবাসায় তৃপ্ত, মুগ্ধ হয়। হঠাৎ উড়ে আসা কোন ছোট্ট চড়ুইয়ের নিরাপত্তায় লাইট-ফ্যান বন্ধ রাখার দুর্লভ দৃশ্য কেবল রশীদিয়াতেই চোখে পড়বে। রশীদিয়ার অনেক কিছুই এমন অবিশ্বাস্য।

১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ। মুহতামিম মুফতী শহীদুল্লাহ সাহেব দীনের খিদমতের জন্য নিজ দেশে ফিরে এসেছেন। নিজ বাসগৃহের ছোট্ট ছাপড়া মসজিদের বারান্দায় চার পাঁচজন ছাত্র নিয়ে রশীদিয়ার ভিত গড়েছেন। পরবর্তী বছর আরেকটু জায়গা নিয়ে। আজ সে রশীদিয়া পরিণত হয়েছে এক মহীরূহে। দশ একর জমিতে প্রায় চার সহস্র তালিবে ইলম আর ১১০জন উস্তাদ নিয়ে সমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। তা'লীম-তরবিয়াত, আমল-আখলাক আর শিষ্টতার পূর্ণতা যে কেউ দেখামাত্রই বুঝতে পারবে। উস্তাদগণের মেহনত-মুজাহাদা, বিনয়-নম্রতার বর্ণনাও শেষ করা যাবে না। নায়েবে মুহতামিম মুফতী ফয়যুল্লাহ সাহেব বেশ সুদর্শন, প্রাজ্ঞ একজন তরুণ আলেম। চেহারায় ইলম ও নম্রতার ছায়া স্পষ্ট। আমাদের সঙ্গে থেকে তিনি সারাটা সময় রশীদিয়ার সবকিছু দেখিয়েছেন। মুহতামিম হযরতসহ সিনিয়র উস্তাদগণ নিজহাতে আপ্যায়ন করেছেন।

বড় ভাই শফীকুর রহমান ভাই নাযিমে দারুল ইকামা মামুন সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার দৃষ্টিতে রশীদিয়ার

এতোটা তারাক্কীর বাহ্যিক কারণ কী মনে হয়? তিনি বললেন, মুহতামিম সাহেবের আকাবির ও আসলাফের যথার্থ অনুকরণ, বিনয়-নম্রতা আর স্বচ্ছ মু'আমালাত-মু'আশারাত এবং সমস্ত আসাতিযায়ে কেরামের একান্ত আন্তরিকতা ও সর্বাত্মক মুজাহাদায় লিপ্ত থাকাই এ জামি'আর উন্নতির রহস্য। এ প্রসঙ্গে তিনি কিছু ঘটনাও তুলে ধরলেন যেখানে মুহতামিম সাহেবের তাকওয়া, খোদাভীতি ও স্বচ্ছ লেনদেনের পবিত্র চিত্র ফুটে উঠেছে। এখানেও মানিকগঞ্জী হুযূর প্রাণ খুলে বয়ান করেছেন। এখানেও সমস্ত উস্তাদগণের হাতে রাবেতা তুলে দেয়া হয়েছে। পরম যত্নে তারা আমাদের রাবেতা গ্রহণ করেছেন। কেউ নিজেদের পত্রিকাও এতোটা আপন করে লুফে নেয় না। আমার মনে হল তাদের ছাত্ররা জীবনের মহা উপকারী হিসেবেই রাবেতাকে সংগ্রহ করবে এবং নিয়মিত উপকৃত হবে।

আমাদের পরবর্তী মঞ্জিল দারুল উলূম ফেনী। দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন মাওলানা ইবরাহীম রহ.। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে এর যাত্রা শুরু। বর্তমানে মাওলানা নূরুল্লাহ সাহেব মাদরাসাটি পরিচালনা করছেন। শহরের প্রাণকেন্দ্রে চার শতাধিক ছাত্রের জন্যে বেশ সাজানো-গোছানো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

এখানে রাহমানিয়ার নায়েবে মুহতামিম সাহেবের বয়ান শেষে আমরা ফুলগাজী আশরাফিয়া মাদরাসা অভিমুখে যাত্রা করি। ফেনীর শেষ সীমান্তে ১৩৬২ হিজরীতে প্রতিষ্ঠিত একটি শিক্ষাকেন্দ্র। এখানকার মুহতামিম প্রবীণ বুযুর্গ আল্লামা হাবীবুর রহমান সাহেব ফেনী জেলার আঞ্চলিক শিক্ষাবোর্ড তানযীমের সেক্রেটারী হিসেবে নিয়োজিত আছেন। তিনি হজ্জের সফরে থাকায় তার সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। হযরতের সুযোগ্য পুত্র জামি'আর শিক্ষা পরিচালক মুফতী যুবায়ের আহমাদ সাহেব আমাদের স্বাগত জানান। পূর্ব পরিচিতের ন্যায় সীমাহীন আন্তরিকতা প্রদর্শন করেন। রাহমানিয়ার শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদ রাবেতার মুহতারাম কর্মকর্তা শ্রদ্ধেয় আনওয়ারুল হক সাহেব রাবেতার পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে লেখার জন্য আহ্বান করেন এবং রাবেতার সৌজন্য কপি সকলকে হাদিয়া করেন।

ছাগলনাইয়ার পথে

গন্তব্য ছাগলনাইয়া। দিনের দ্বিতীয় প্রহর। রোদে ঝলমল করছে পথঘাট। যে পথ ধরে চলছি, একসময় এটি ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়ে হিসেবে ব্যবহৃত হত। সচেতন যাত্রীরা ফেনী শহরের যানজট এড়াতে এখনো এ পথ বেছে নেন। পথের ধারে সারি সারি গাছ। দুপাশ থেকে ডালপালা নুয়ে এসে পথের ওপর সৃষ্টি হয়েছে 'গাছতোরণ'; এমনই ঘন, রোদ গলবার জো নেই।

আমাদের গাড়ি ছাগলনাইয়ার মওলানা রূহুল আমীন সাহেবের জামি'আ ইসলামিয়া আযীযিয়া কাসেমুল উলূম মাদরাসায় প্রবেশ করলো। কুতবে যামান হযরত শাহ মুফতী আযীযুল হক সাহেব ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে এর গোড়াপত্তন করেন। নানুপুরের হযরত সুলতান আহমাদ নানুপুরী রহ. এই মাদরাসার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শহরের কেন্দ্রে বর্তমানে সহস্রাধিক তালিবে ইলমের এক উন্নয়নশীল প্রতিষ্ঠান। মাদরাসার কয়েকজন উস্তাদ বেশ বয়স্ক। যাদের চেহারায় গাম্ভীর্যের পাশাপাশি ইলমী প্রজ্ঞাও খুব জ্বলজ্বল করছে।

মাদরাসার শিক্ষা পরিচালক মাওলানা জাবের সাহেব জানালেন, ইন্ডিয়ার সীমান্ত একেবারে সন্নিকটে; মাত্র এক কিলোমিটার পথ। কিন্তু তাতে কী হবে! আমাদের গন্তব্যের পথ যে আরো অনেক দূরে; আকাশের প্রান্ত যেখানে যমীন ছুঁয়েছে। আমরা ছুটে চললাম ফেনীর চিলুনিয়া এলাকার জামি'আ মাদানিয়ার পানে।

ছবির মত সাজানো গোছানো পরিচ্ছন্ন অসাধারণ সুন্দর জামি'আ মাদানিয়া। তা'লীম-তরবিয়াত, আখলাক ও যোগ্যতা বিবেচনায় ফেনী জেলার একেবারে শীর্ষ পর্যায়ের একটি প্রতিষ্ঠান। মুহতামিম মুফতী সাইফুদ্দীন সাহেব নিজেই যোহরের ইকামত দিলেন। পূর্ণ সুন্নাহ মোতাবেক দাওয়াতুল হকের তরযে। তিনি কর্মতৎপর উদ্যমী একজন আলেম। সঙ্গে পেয়েছেন নায়েবে মুহতামিম পদে আরেক ইলমী ব্যক্তিত্ব মুফতী আহমাদুল্লাহ সাহেবকে। নামায শেষে উস্তাদ-ছাত্র সকলের উপস্থিতিতে সময়োপযোগী বেশ প্রয়োজনীয় আলোচনা করলেন মানিকগঞ্জী হুযূর। দেখলাম, মুফতী সাহেব হুযূরের লিখিত 'কিতাবুস সুন্নাহ' এখানে তা'লীমের জন্য নির্ধারিত। আমাদের মুমিনপুরী হুযূরের শূন্যতা এখানেও বেশ অনুভূত হল। কিন্তু কি করা যাবে! রব্বে পাকের কাছে আমাদের এ সফর হুযূরবিহীন মঞ্জুরী ছিল।

পরম আখলাক আর উন্নত মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন মুহতামিম সাহেব। নিজ বাসার তৈরি খাবার স্বহস্তে পরিবেশন করেছেন। আমাদের নওজোয়ান কয়েকজনকেও যথার্থ ইজ্জত ও সম্মান করেছেন; যা ভোলার নয়।

জামি'আ মাদানিয়া অধ্যায়ের ইতি টেনে উপস্থিত হলাম শর্শদি ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদরাসা চত্বরে। ফেনীর প্রাচীনতম একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এটি। হযরত থানবী রহ. এর অন্যতম খলীফা হযরত শাহ নূর বখশ রহ. ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। নূর বখশ রহ. এর উত্তরসূরী ও মাওলানা নজীর আহমাদ রহ. এর সাহেবযাদা মাওলানা হাফেয রশীদ আহমাদ দা.বা. মাদরাসার বর্তমান মুহতামিম। জীবনের প্রায় শেষ সময় তিনি পার করছেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও এই অশীতিপর বৃদ্ধ বুযুর্গ আমাদের আপ্যায়নের ত্রুটি করেননি। সশরীরে চলে এসেছেন মেহমানগণের অভ্যর্থনায়।

ফেনীর অন্যান্য সব প্রতিষ্ঠানের ন্যায় এখানকার মুহতামিম সাহেবকেও মনে হল তিনি সর্বদাই মাদরাসায় অবস্থান করেন এ থেকে বিষয়টি সহজেই অনুমেয় যে, মাদরাসার জন্য তারা কতটা নিবেদিত প্রাণ।

মসজিদে বয়ান শেষে আমরা অফিস কক্ষে বসলাম। দেখলাম জামি'আর সকল উস্তাদ উপস্থিত হয়েছেন। এখানে প্রায় সকলেই প্রবীণ উস্তাদ। প্রতিটা চেহারা থেকেই ইলমী নূর ও আভিজাত্য ঝরে পড়ছে। আমাদের মাওলানা নজরুল ইসলাম অন্যান্যদের তুলনায় এ প্রতিষ্ঠানের একেবারেই নবীন উস্তাদ। তবে বেশ সুনামের সাথে তাদরীসের কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন। সফরের শুরু থেকে আমাদের সঙ্গে থাকা তরুণ আলেম মাওলানা সাইফুল ইসলাম সাহেব এ প্রতিষ্ঠানের একজন যোগ্য উস্তাদ।

মাদরাসা চত্বরে কালের স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ১১০০ হিজরীর দিকে নির্মিত প্রায় চারশত বছরের পুরনো একটি জামে মসজিদ। আমরা ভয়ে ভয়ে প্রাচীনতম এ মসজিদটিতে প্রবেশ করলাম। প্রবেশ করতেই ভয় জনিত শিহরণে কেঁপে উঠলাম। না জানি পবিত্র পেশানীর স্পর্শধন্য কোন জায়গা এ হতভাগার পদপিষ্ট হয়। ভয়ে ভয়ে ধীর পায়ে মেহরাবের ফলকটির কাছে পৌছলাম। সেখানে লেখা-

بسم الله الرحمن الرحيم
محمد علی سودری مجاہد اعظم
۱۱۰۰ھ

লেখাটি আমাকে অভিভূত করেছে। ফলকে লেখা মুজাহিদে আযম মুহাম্মাদ আলী চৌধুরী রহ. এর পরিচয় জানতে খুব ইচ্ছে হল। যা জানলাম তার সারসংক্ষেপ হচ্ছে- 'ঢাকার নায়েব নাযিম ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মাদ আলী চৌধুরীকে ফেনী এলাকার ফৌজদার নিযুক্ত করেন। অত্যাচারী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এই সিংহশার্দুল গর্জে ওঠায় এবং বিদ্রোহ করায় ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে অবৈধ ইংরেজ সরকার তাকে পদচ্যুত করে।' বাকি ইতিহাস জানতে পারিনি। তবুও কেন জানি এ বীর-সেনানীর প্রতি ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠলাম। ইচ্ছে করল হৃদয়ের সবটুকু শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা উজাড় করে দিই। সালাম তোমায় হে বীর মুজাহিদ! শত সহস্র সালাম।

শেষ বেলা

প্রিয় পাঠক! এ পর্যায়ে আমরা সফরের শেষ প্রান্তে। ফেনী জামি'আর অফিস কক্ষে সফরের সর্বশেষ বৈঠক চলছে। রাবেতা মুরুব্বীগণ হৃদয় উৎসারিত দরদী গলায় জামি'আর উস্তাদগণকে পরামর্শ দিচ্ছেন। সফরের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরছেন। রাবেতা সদস্যগণ তাদের সর্বশেষ তোহফা প্রত্যেকের হাতে হাতে তুলে দিচ্ছেন। কেউ কেউ রাবেতায় নিয়মিত লিখতে জোরালো আবেদন করছেন। ফেনী জামি'আর মুহতামিম মাওলানা মুমিনুল হক জাদীদ সাহেব আমাদর রাতের আপ্যায়ন নিয়ে ব্যস্ত।

মাওলানা মুমিনুল হক জাদীদ ফেনী জামি'আর কাণ্ডারীর ভূমিকায় আছেন। অত্যধিক কর্মঠ ও বিনয়ী একজন আলেম। সফরের শুরু থেকে প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের সঙ্গ দিয়েছেন। রাবেতার আদর্শকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। তিনি সফর সফল করতে যথার্থ অবদান রেখেছেন। সে ঋণ শোধ হবার নয়।

মাওলানা আব্দুল কাহের আলমাদানী দা.বা. ফেনী উলামাবাজার মাদরাসার একজন প্রবীণ মুহাদ্দিস। সদা হাস্যোজ্জ্বল অমায়িক সঙ্গী হয়ে সফরের আগাগোড়া আমাদের পাশে থেকেছেন। বয়স প্রৌঢ়ত্বের কাছাকাছি হলেও যৌবনের উচ্ছলতা হারাননি। তার নিখাঁদ আন্তরিকতায় অনেকবার আমরা মুগ্ধ হয়েছি। হযরতের লোভনীয় পান-সুপারী থেকে আমাদের নায়েমে তা'লীমাত সাহেবও বেশ উপকৃত হয়েছেন।

আমরা ফেনীর উলামায়ে কেরামকে অত্যন্ত বিনয়ী ও সাদেগীর গুণে গুণান্বিত পেয়েছি। তাদের ইলমী গভীরতা ও আপ্যায়ন-আন্তরিকতাও যে কাউকে মুগ্ধ করবে আমাদের সফরের সূচনা লগ্নে, মধ্য মুহূর্তে, শেষ বেলায় সর্বত্র তারা এগিয়ে এসেছেন। রাবেতার পক্ষ থেকে তাদের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি।

ফিরে আসার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন। একে একে সকলে গাড়িতে উঠে বসেছেন। এখানেই থেকে যাবে মাওলানা নজরুল ইসলাম। শুরু শেষ সব প্রান্তে সে ছায়ার মত লেগে ছিল। যতকিছু দরকার সবকিছুই করেছে নাওয়া-খাওয়া সবকিছু ভুলে। নায়েবে মুহতামিম সাহেব হুযূর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখন কোন্ দিকে যাবে? নজরুল ইসলাম নীরব দাঁড়িয়ে। হয়তো চেষ্টা করছিল নিজেকে সংযত রাখার। কিন্তু সাধ্যের বাঁধ ভেঙ্গে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। দীর্ঘদিন পর উস্তাদগণকে আজ কিছু সময়ের জন্য সে কাছে পেয়েছে, যাদের ত্যাগে সে জীবনের সবকিছু পেয়েছে। যারা তাকে তিলেতিলে আজকের এই পূর্ণতায় এনে দিয়েছেন। এমন মহা মুহসিন পিতৃতুল্য আসাতিযায়ে কেরামের বিচ্ছেদে সে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল। হুযূর তাকে বুকে জড়িয়ে রাখলেন যতক্ষণ না শান্ত হল। অনেক অনেক দু'আ দিলেন। বললেন, আমরা তোমার উপর সন্তুষ্ট। আল্লাহ পাকও তোমার উপর সন্তুষ্ট থাকবেন ইনশাআল্লাহ। মানিকগঞ্জী হুযূরসহ সকলেরই হৃদয় থেকে পরম তৃপ্তির দু'আ বেরিয়ে এলো। অশ্রুসজল চোখে আমি শুধু তাকিয়ে ছিলাম ওর দিকে। তখনো সে জমাট শোকে ঠায় দাঁড়িয়ে।

লেখক : শিক্ষক, জামি'আ বাইতুল আমান মিনার মসজিদ ও মাদরাসা কমপ্লেক্স, তাজমহল রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

দ্বি-মাসিক রাবেতায়
লেখা পাঠানোর ঠিকানা

রাবেতা কার্যালয়

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট
সাতমসজিদ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

ই-মেইল: rabetaar@gmail.com

মোবাইল : ০১৮২৬৬২১৬৬৯
০১৯২৭৩২৪৬৪৭
০১৯১২০৭৪৪৯৫